পারস্য উপন্যাস

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য প্রচার * কলিকাতা

সূচীপত্র

—পুনর্মুদ্রণ—
ফাল্গুন ১৩৬৩

প্রকাশক
—সাহিত্য প্রচার—
২নং বারানসী ঘোষ সেকেণ্ড লেন
কলিকাতা

প্রিণ্টার :
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সূচনা

কাশ্মীর সুলতান শাহ আলম। যেমন বীর, তেমনি বিদ্বান, তেমনি আবার বুদ্ধিমান। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া; ধন দৌলত, লোক লস্কর কোন কিছুরই অভাব নাই।

সুলতানের এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে ইদ্রিস দেখতে প্রায় বাপের মতই। আর স্বভাব চরিত্রেও সেই রকম। মেয়ে ফরোখনাজ। বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনিও ভায়ের চেয়ে কম যান না। তার উপর আবার অপরূপা সুন্দরী তিনি। যেন সাক্ষাৎ ডানা কাটা পরী। সুলতান দেখেন আর ভাবেন কার হাতে দেওয়া যায় এমন রত্ন!

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ফরোখনাজের রূপের কথা। ছুটে আসেন যত দেশ বিদেশের সুলতান আর শাহজাদা। ঘুরে বেড়ান রাজধানীর পথে পথে—যদি একবার চোখে পড়ে ফরোখনাজের রূপ লাবণ্য। ফিরেও তাকান না ফরোখানাজ তাঁদের পানে। তাঁর একটা মস্ত সখ, দলবল নিয়ে শিকার করা। সমবয়সী সখী আর খোজাদের নিয়ে তিনি প্রায়ই শিকার করতে যান বন-জঙ্গলের ভেতর।

শহরের লোক ভেঙ্গে পড়ে রাস্তার উপর। যদি একটিবার নজরে পড়ে শাহজাদীর অপরূপ সৌন্দর্য্য। চারিদিকে ভিড় জমে যায়। এগোয় কার সাধ্য।

"হঠো! হঠো!" হেঁকে উঠে খোজার দল। কিন্তু কেউ সরে না এক পাও। ক্ষেপে উঠে তারা। ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতার উপর। তর তর ধার নাঙ্গা তলোয়ার ঘুরতে থাকে ডাইনে বাঁয়ে, সামনে। কারও যায় হাত পা, কারো যায় চোখ। ছটোপাটি, ঠেলাঠেলি, পালিয়ে যায় সব, রাস্তা সাফ। ফরোখনাজ চলে যান শিকারে।

এইভাবে দিন যায়। যখনই ফরোখনাজ শিকারে যান, ছুটে আসে লোকজন, আর মারধর খেয়ে মরে। তবু আবার আসে। যেন আগুনে—পতঙ্গ। রাজ্য জুড়ে হৈ চৈ। কথা সুলতানের কানে ওঠে। ভারি দুঃখ হয় তাঁর মনে। এরকম অন্যায় ত' চলতে দেওয়া উচিত নয়। ভেবে চিন্তে সুলতান বন্ধ করে দেন মেয়ের শিকার খেলা।

একে পিতা তায় আবার সুলতান। হুকুম না মেনে উপায় কি! বন্ধ হয়ে গেল শাহজাদীর শিকার খেলা। মূর্খ পুরুষ-গুলোর জন্যই ত' এত হল। ভারী চটে গেলেন তিনি সমস্ত পুরুষ জাতটারই উপর। স্থির করলেন, যতদূর সম্ভব এদের তিনি এড়িয়ে চলবেন।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন রাত্রে শাহজাদী স্বপ্ন দেখলেন, দলবল নিয়ে তিনি যেন শিকারে গেছেন। তাঁদের দেখে বনের জন্তু জানোয়াররা সব ছুটে পালাচ্ছে। ফরোখনাজ দুটো হরিণের পিছু পিছু তাড়া করলেন। তাদের একটা পুরুষ আর একটা মাদী। ছুটতে ছুটতে পুরুষটা এক শিকারীর জালে,

আটকা পড়লো। মাদীটা কিন্তু পালালো না। পুরুষটাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

ঘোড়া থামিয়ে শাহজাদী চেয়ে রইলেন সেদিক পানে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পুরুষটা ছাড় পেয়েছে। আর তার বদলে আটকা পড়েছে মাদীটা। ছাড়া পেয়েই পুরুষটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট। ফিরেও তাকালো না মাদীটার পানে। শাহাজাদীর মনে ভারী কষ্ট হলো। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ছুটে গেলেন মাদীটাকে ছাড়িয়ে দিতে। এমনি সময় ঘুম গেল ভেঙ্গে।

বড়ই খারাপ হয়ে গেল তাঁর মন। পুরুষ জাতটাই এমনি। স্বার্থপর, নেমকহারাম। ফরোখনাজ প্রতিজ্ঞা করলেন যে জীবনে তিনি বিবাহ কববেন না।

এদিকে হয়েছে কি। দেশ বিদেশের সুলতান বাদশাহরা অনবরত লোক পাঠাতে লাগলেন কাশ্মীর দরবারে। ফরোখনাজের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে। সব্বাই চান তাঁদের ছেলের সাথে ফরোখনাজের বিবাহ দিতে। ফরোখনাজ কিন্তু তাতে মোটেই রাজী হন না। ভাল ভাল সম্বন্ধ ফিরে গেল। ভারী ভাবনায় পড়লেন সুলতান। কি করা যায়!

শাহজাদীর ধাত্রী ফতিমা। ছেলেবেলা থেকে তিনি মানুষ হয়েছেন তার কোলে পিঠে। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে ফতিমা শাহজাদীকে। সুলতান ধরে পড়লেন ফতিমাকে। বললেন তাঁর দুঃখের কথা।

ফতিমা বললেন, "জাঁহাপনা, শিকারে যাওয়া বন্ধ হতেই শাহজাদীর মন ভারী খারাপ হয়ে গেছে। তার উপর আবার একদিন রাত্রে কি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন; যাতে করে সমস্ত পুরুষ জাতটারই উপর তাঁর মন একেবারে বিষিয়ে উঠেছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে কিছুতেই বিয়ে করবেন না।"

"শোন কথা", ঝাঁপিয়ে উঠলেন সুলতান। "মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে, আর বলে কি না বিয়ে করবো না। নাঃ, এ চলবে না ফতিমা। তোমার উপর ভার রইলো। যেমন করে পার তাকে বিয়েতে রাজী করাও।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় শাহজাদী বসে হাসি-ঠাট্টা করছেন সখীদের সাথে। এই সময় ফতিমা গিয়ে হাজির হলো সেখানে। "আরে, দাইমা যে! এসো, এসো, তোমার পাত্তাই ত' আর পাওয়া যায় না। গল্প না শুনতে পেয়ে মনটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বসে বেশ ভাল একটি গল্প শুরু করে দাও তো।" হাসতে হাসতে শাহজাদী উঠে ধরলেন ফতিমার হাত। টেনে বসালেন সকলের মাঝখানে।

বসে পড়লো ফতিমা শাহজাদীর পাশে। সস্নেহে তাঁর রেশমের মত নরম চুলগুলির উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললো "আসতে তো চাই মা আমি তোমাদের কাছে সর্ব্বদা; কিন্তু অন্দরের যা কাজ তাই শেষ করে উঠতে পারি না। তাই আর আসা হয় না।" আব্দারের সুরে ফরোখনাজ বললেন, "তোমার ত' কেবল কাজ আর কাজ। ও তো তোমার লেগেই আছে দাই মা। তা বলে আমরা গল্প শুনতে পাব না?"

মৃদু হেসে ফতিমা বললো, "তাই তো এলাম মা। ভাবলাম বহুকাল আমার আম্মাজানকে কোন গল্প শুনাইনি। আজ একটু শুনিয়ে আসি।" "বেশ, বেশ, দাইমা, তুমি খুব ভাল মেয়ে। সুরু করে দাও তোমার গল্প। আমরা সব্বাই শুনবো।" ঘিরে বসলো সখীরা ফতিমা আর শাহজাদীকে।

ফতিমা সুরু করলো,—

আবুল কাসেমের গল্প

বাগ্‌দাদের খলিফা হারুণ-অল রসিদ যেমন বিদ্বান তেমন বুদ্ধিমান, আবার তেমনি বিক্রমশালী। তাঁর দরবারে ছিল বড় বড় গুণী জ্ঞানীর মেলা। প্রজারা ছিল ঠিক তাঁর সন্তানের মত। তাদের অবস্থা জানবার জন্য খলিফা প্রায়ই রাত্রিবেলা ছদ্মবেশে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন; নিজের চোখে দেখে যাদের যা অভাব তা দূর করতেন।

এহেন খলিফারও কিন্তু একটা মস্ত বড় দোষ ছিল। যখন তখন তিনি আত্ম প্রশংসায় একেবারে মেতে উঠতেন। এ জন্য লোকে আড়ালে তাঁর নিন্দা করত। খলিফা মোটেই এসব যেন বুঝতে পারতেন না। প্রধান উজীর জাফরের এসব মোটেই ভাল লাগতো না। একদিন তিনি নিরালায় খলিফাকে বললেন, "জাঁহাপনা, দিন দুনিয়ার মালিক, অধীনের একটি আরজ আছে। যদি অভয় দেন ত' বলি।"

খলিফা বললেন "হ্যাঁ জাফর; যা তোমার বলবার আছে নির্ভয়ে বল।"

জোড়হাতে উজির বললেন, জাঁহাপনা! আপনার গুণের সীমা নেই। কিন্তু আপনি আত্মপ্রশংসায় বড় বেশী মেতে ওঠেন লোকে এরজন্য আড়ালে আপনার নিন্দা করে। শুনে বড় কষ্ট হয়। তাই অধীনের একমাত্র আরজ আপনি ওরকম আত্ম-প্রশংসা করে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবেন না।"

বিরক্ত হয়ে উঠলেন খলিফা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কোথায় কখন আত্মপ্রশংসা করলাম বল তো।"

মাথা নুইয়ে জাফর বললেন, "জাঁহাপনা ! গত ঈদ্ পরবের দিন গরীব দুঃখীদের দান খয়রাতি করে আপনি খুসীর চোটে বড় বেশী আত্মপ্রশংসা করেছেন। এ সকলেই শুনেছে। এরকম আরো অনেকবার হয়েছে। সব ঘটনা আমার মনে নেই।"

খলিফা বললেন, "তা নাহয় করেছি। কিন্তু বলতে পার উজির সাহেব, এ দুনিয়ায় আমার মত দান খয়রাত করে এমন আর কজনা' আছে।"



উজিরের যেন জিদ বেড়ে গেল। দুহাতে সেলাম করে বললেন, "জাঁহাপনা ! অধীনের বেয়াদপি মাপ করতে হুকুম হয়। বড় বেশীদূর যেতে হবে না। আপনারি খালিফতি বসরা সহরে আছেন সেই লোক। হুজুরের প্রজা। নাম আবুল কাসেম। তাঁর মত দান খয়রাত করতে আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। অথচ ভুলেও তিনি এসব কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন না।"

ক্ষেপে উঠলেন খলিফা "বেয়াদব ! আমার খাও, আর আমারই সামনে আমার নিন্দা কর। কোথাকার কে আবুল কাসেম ! সে হয়ে গেল আমার চেয়ে বড় দাতা। আচ্ছা, এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।" দাঁতে দাঁত কড়মড় করে রক্তচক্ষু খলিফা হাঁক দিলেন, "কে আছিস্ রে এখানে— ।" মহল পাহারাদার হাবসী সর্দার আব্বাস এসে সেলাম করে দাঁড়াল, "কি হুকুম জাহাপনা ?"

খলিফা জাফরকে দেখিয়ে বললেন, "নিয়ে যাও এই বেয়াদবকে কয়েদখানায়। পরে বিচার হবে।"

হুকুম তামিল হতেই হবে। হাবসী সর্দার জাফরকে নিয়ে আটকে রাখল কয়েদ খানায়।

কথা কানে হাটে। প্রধানা বেগম জেবেদী শুনলেন একথা। মনটা তাঁর ভারী খারাপ হয়ে গেল। খলিফা অন্দরে এলে সুযোগ বুঝে পাড়লেন তিনি জাফরের কথা। খলিফা বললেন, "তুমি জান না জেবেদী, জাফর কতদূর বেড়ে উঠেছে। কোথাকার কে আবুল কাসেম ! আমার সাথে সে তুলনা করে তার।"

বেগম বললেন. "তা যেন করলেন, কিন্তু আপনার পক্ষেও হুট করে তাঁকে একেবারে কয়েদ করাটা যেন কেমন মনে হয়। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে তা একবার জেনে নেওয়া উচিত ছিল। এত বড় জ্ঞানী আর প্রাচীন লোক, তিনি কি না জেনে শুনেই আপনাকে একটা যা তা কথা বলে বসবেন ?"

কথাটা খলিফার মনে ধরল। তাই ত, একবার জেনে নিলে হয়, জাফরের কথা সত্যি কি মিথ্যে। ভেবে চিন্তে খলিফা বললেন, "তোমার কথাই নিলাম জেবেদী। আমি কালই ছদ্মবেশে বসরায় যাব। খবরাখবর নিয়ে যদি দেখি জাফরের কথা সত্যি, তবে তাকে তো ছেড়ে দেবই, উপরন্তু ভাল ইনাম

দিয়ে সম্মানিত করব। আর যদি মিথ্যে হয় তবে তার ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

পরদিন নিশুতি রাতে খলিফা বেরিয়ে পড়লেন বসরার পথে —ধনী সওদাগরের বেশে, ঘোড়ায় চেপে। রাত ভোর হওয়ার সাথে সাথে সহরে পৌঁছে তিনি উঠলেন এক সরাইখানায়। ধনী সদাগর দেখে সরাইয়ের মালিক তাঁকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর খলিফা কথায় কথায় মালিককে বললেন, "আচ্ছা জনাব, আবুল কাসেম সাহেবের সাথে আপনার আলাপ আছে কি?" মালিক বললে, "তা আছে বৈকি জনাব। তাঁর সাথে আলাপ পরিচয় নেই এমন লোক একজনও পাবেন না এ তল্লাটে।"

খলিফা বললেন, "তিনি নাকি খুব দান খয়রাত করেন?"

"তা আর বলতে! গরীব দুঃখীর মা বাপ তিনি। তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাত টের পায় না। আর তেমনি অমায়িক আর ভদ্র। যান না, একবার দেখা করে আসুন গে তাঁর সাথে। বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি কি না।"

পরদিন ভোরে উঠেই খলিফা হাত মুখ ধুয়ে চললেন আবুল কাশেমের বাড়ি। পথে পড়ল এক মস্তবড় জহুরীর দোকান। সেই দোকানের ভেতর ঢুকে তার মালিককে বললেন, "জনাব, আবুল কাসেম সাহেবের বাড়িটি কোন্ দিকে যদি বলে দেন তবে বড়ই উপকার হয়।"

"আবুল কাসেমের বাড়ি চেনেন না?" অবাক হয়ে তাকাল জহুরী খলিফার পানে।

খলিফা লজ্জা পেয়ে বললেন, "মাফ করবেন জনাব, আমি তো এ অঞ্চলের লোক নই। কি করে তাঁর বাড়ি চিনবো বলুন।"

"তাই বলুন, আপনি বিদেশী। নইলে কাসেম সাহেবের বাড়ি চেনে না এ অঞ্চলে এমন লোক কে আছে। যাক, আমি ঠিক করে দিচ্ছি সব।" পাশেই দাঁড়িয়েছিল এক ছোকরা চাকর। জহুরী তাকে বললে, "যা তরে এই সাহেবকে কাসেম সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে আয়।"

ছেলেটি খলিফার সাথে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারপর এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে আবুল কাসেমের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সাদা ধবধবে শ্বেত পাথরের তৈরী মস্ত বড় বাড়ি। তাতে নানা রঙ্ বেরঙের পাথর কেটে ফুল, লতা পাতা আঁকা। সদর দরজায় বসে আছে গুটিকয়েক পাহারাওয়ালা। দলে দলে লোকজন আসছে, যাচ্ছে। কেউ তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাও করছে না কিছু। এ যেন তাদের নিজেদেরই বাড়ি।

খলিফা ফটকের ভেতরে গিয়ে পাহারাওলাদের একজনকে বললেন "দেখ বাপজান, আমি একজন বিদেশী সওদাগর। তোমার মনিবের সাথে দেখা করতে চাই। তাঁকে একটু জানাবে আমাদের কথা?"

পাহারাওয়ালা বললে, "জানাবারও কোন দরকার নেই হুজুর আসুন, এক্ষুণি তাঁর সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।" চললেন খলিফা তার সাথে। দোতলার উপর মস্ত বড় একখানি ঘর, নানা আসবাব পত্রে সাজান। তার ভেতর সুন্দর ফরাস পাতা। ফরাসের উপর বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। সাদাসিদে পোষাক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রশান্ত মুখখানিতে মৃদু হাসি।

পাহারাওয়ালা তাঁকে সেলাম করে বললে, "হুজুর, ইনি একজন বিদেশী সওদাগর। আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।"

"আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।" ব্যস্তে ব্যস্তে

ভদ্রলোক নেমে এলেন ফরাস থেকে। খলিফাকে অভ্যর্থনা করলেন সমাদরে।

খলিফা বললেন, "আপনিই তবে সেই বিখ্যাত দাতা আবুল কাসেম।"

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মাথা নুইয়ে সেলাম করে বললেন, "এ গরিবের নাম আবুল কাসেমই বটে। আর যা শুনেছেন ওসব কিছু না। খোদার দেওয়া জিনিষ। তাঁরই কাচ্চা বাচ্চাদের কিছু কিছু দিয়ে থুয়ে একটু আমোদ করি। এই আর কি।"

খুসীতে ভরে উঠলো খলিফার মন। কাসেমকে বললেন, "তা যাই হোক। আপনার দর্শন পেয়ে কিন্তু আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে আপনার কথাবার্ত্তা আর মধুর ব্যবহার।"

হাত জোড় করে আবুল কাসেম বললেন, "জনাব, যাঁরা মহৎ তাঁরা দুনিয়া সুদ্ধ সবাইকেই মহৎ দেখেন। এ গরিব কিন্তু মোটেই তা নয়। অতি অধম। তা অধমের দরজায় যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, বসে খানিক বিশ্রাম করুন। আর অমনি সামান্য কিছু গ্রহণ করুন গরিবের যা জোটে, আমি ধন্য হয়ে যাই।"

খলিফাকে ফরাসের উপর বসিয়ে আবুল কাসেম বসলেন নীচে গালিচার উপর। খলিফার শত অনুরোধেও উপরে বসলেন না। এই সময় দশ বার জন চাকর নানারকম মিষ্টি, খাবার আর শরবৎ এনে রাখল খলিফার সামনে। তারপর এল অপরূপ রূপসী জনকয়েক মেয়ে। তাদের হাতে সোনার রেকাবী ভর্ত্তি নানা রকমের মিষ্টি ফল আর সুগন্ধি ফুলের তোড়া। তারাও সে সব খলিফার সামনে সাজিয়ে রেখে চলে গেল।

আবুল কাসেমের অনুরোধে খলিফা তার কিছু কিছু খেয়ে দেখলেন। চমৎকার স্বাদ। আর কি সুন্দর শরবৎ। খেয়ে প্রাণ শীতল হয়ে গেল খলিফার।

খাওয়া দাওয়া শেষ হল। কাসেম খলিফাকে নিয়ে গেলেন আর এক কামরায়। অপূর্ব্ব সাজসজ্জা সেই ঘরখানির। সোনা, রূপা, হীরা জহরতের ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন খলিফা। জাফর তবে ঠিকই বলেছিল। এর মত ধনবান আর অমায়িক দুনিয়ায় দুজন আছে বলে তো মনে হয় না।

ঘুরে ঘুরে দেখছেন খলিফা ঘরখানির কারুকার্য্য। এই সময় দশজন সুন্দরী অল্পবয়স্কা মেয়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। তাদের প্রত্যেকের হাতে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র। ঘরখানা ঝলমল করে উঠলো, তাদের রূপের বাহার আর পোষাক পরিচ্ছদের জৌলুসে।

আবুল কাসেম খলিফাকে গদিতে বসিয়ে নিজে বসলেন নীচে গালিচার ওপর। মেয়েরা সুরু করল নাচ গান। যেমন মিষ্টি সুর আর তেমনি বাজনা! মোহিত হয়ে গেলেন খলিফা। এমন গান বাজনা তাঁর হারেমেও হয় না। কি ভাগ্যবান্ এই আবুল কাসেম।

গান বাজনা শেষ করে যুবতীরা চলে গেল। আবুল কাসেম পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলেন একগাছি সোনার ছড়ি আর চমৎকার একটি রূপার গাছ, পাতাগুলি কিন্তু সোনার। পাতায় পাতায় হীরের ফুল আর মোতির ফল। তার উপর বসে আছে চুনী-পান্নার তৈরী এক ময়ূর।

গাছটি খলিফার সামনে রেখে আবুল কাসেম ময়ূরের মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন সোনার ছড়ি। অমনি অবাক কাণ্ড! ডাল পাতার ভেতর থেকে বেরোতে লাগল মধুর বাজনার সুর আর সঙ্গে সঙ্গে

ময়ূরটি পেখম খুলে সুরু করল অপূর্ব্ব নৃত্য। গোলাপী আতরের খোসবুতে ঘরখানি হয়ে উঠলো ভরপূর। খলিফা স্তব্ধ! একি সত্যি না স্বপ্ন!

নাচ বাজনা থামল। চমক ভেঙ্গে খলিফা বললেন, সাবাস কাসেম সাহেব! ধন্য আপনার জীবন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এমন চমৎকার জিনিষ আপনি কোথায় পেলেন?"

কথা বললেন না আবুল কাসেম। গাছ আর ছড়িটি নিয়ে চলে গেলেন। বিরক্তিতে ভরে গেল খলিফার মন। লোকটা যেমন কি রকমের! ভদ্রতা জানে না মোটেই।

মুখ ভার করে বসে আছেন খলিফা। কিছুক্ষণ পর আবুল কাসেম আবার সেখানে এলেন—আর এলো একটি ছেলে। চমৎকার তার চেহারা। হাতে সোনার পেয়ালা ভর্ত্তি একপেয়ালা মিষ্টি শরবৎ। ছেলেটি খলিফাকে সেলাম করে পেয়ালাটি তার হাতে দিলে। খলিফা এক চুমুকে তা শেষ করেই দেখেন তা আবার ভর্ত্তি হয়ে গেছে।

চমকে উঠলেন খলিফা। একি ভেল্কীবাজী! অবাক হয়ে তিনি আবুল কাসেমকে বললেন, "এ যে দেখছি আরো অদ্ভুত। এমন জিনিষ কে তোয়ের করেছে জনাব?" আবুল কাসেম বললেন, "তা বলতে পারি না সাহেব। এ জিনিষটি আমি এক ফকিরের কাছ থেকে পেয়েছি।" এই কথা বলেই কাসেম সেই পেয়ালা আর ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেলেন। আচ্ছা লোকত! একটু আগ্রহ দেখাতেই নিয়ে চলে যায়। ভারী অভদ্র লোকটা। দেশে গিয়ে জাফরকে দেখে নেবো একহাত।

চুপ করে বসে ভাবছেন খলিফা। আবুল কাসেম এই সময় আবার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে এক অপরূপা সুন্দরী

কন্যা। তার হাতে একটি রাবাব। থ' বনে গেলেন খলিফা। একি হুরী না পরী! মানুষের এতরূপ।

খলিফার ভাব দেখে কাসেম ত' খুব খুশী। ইশারা পেয়ে মেয়ে গান সুরু করল। তার সাথে রাবাবের বাজনা। কি মিষ্টি গলা! কানে যেন মধু ঢেলে দিল। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল খলিফা সেই অপূর্ব্ব সুরের আলাপ।



গান শেষ হল। খলিফা কাসেমকে বললেন, "জনাব, আপনার মত সৌভাগ্যশালী লোক বোধ হয় দুনিয়ায় আর দুটি নেই। আঃ, কি গানই আজ শুনলাম! আমার—" কথা শেষ হবার আগেই কাসেম মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেলেন।

বারুদের মত জ্বলে উঠলেন খলিফা। "এমন অসভ্য বেয়াদবের সাথে কিনা জাফর তুলনা করেছিল আমার! দেশে গিয়েই তার জিভ টেনে ছিঁড়ব।" আপন মনে খলিফা ভাবছেন

এ সব কথা। এমন সময় দেখা গেল, আবুল কাসেম ঘরে ঢুকছেন। চতুর খলিফা চেপে গেলেন সব কিছু। তারপর হাসি মুখে বসে কাসেমের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। ক্রমে বেলা পড়ে এল। খলিফা কাসেমের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন। আবুল কাসেমও তাঁকে একবারে সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

পথ চলছেন খলিফা, কিন্তু রাগে তাঁর ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে। কি বেয়াদব আর অহঙ্কারী এই লোকটা। বাইরে বিনয়ের অবতার আর ভেতরে এত দেমাক! সত্যিই যদি ও দাতা হতো তবে আমি যে এত প্রশংসা করলাম তাতে অন্ততঃ কিছু ওর আমাকে দেওয়া উচিত ছিল। ও যদি দয়াল আর দাতা তবে কৃপণ কে? দেশে গিয়ে মুর্খ উজিরকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব সে কার সাথে আমার তুলনা করেছিল।

রাগে গরগর করতে করতে খলিফা ফিরে এলেন সরাই-খানায় এসেই দেখেন, একি! সেই মণি মাণিক্য খচিত সোনার গাছ, ময়ুর আর সোনার পেয়ালা নিয়ে সেই সুন্দরী ছেলেটি আগেই সেখানে চলে এসেছে। তার সাথে আছে সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি। আর দশ বারটি উটের পিঠে বোঝাই সোনার মোহর ও হীরে জহরৎ।

ছেলেটি খলিফাকে সেলাম করে তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিলে। চিঠি পড়ে খলিফা তো মুগ্ধ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আবুল কাসেম লিখছেন,—

জনাব,

এই সামান্য জিনিষ কয়টি গ্রহণ করে অধমকে কৃতার্থ করবেন। এই আমার নিয়ম যে, যদি কেউ আমার গরিবখানায় পদধুলি দিয়ে কোন কিছু পছন্দ করেন তো ওসব তাঁরই হয়ে

যায়। ওতে আমার আর কোন দাবী থাকে না। মঙ্গলময় খোদা আপনার মঙ্গল করুন। ইতি।—

আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী

আবুল কাসেম

চিঠিখানা পড়ে খলিফার রাগ একেবারে জল হয়ে গেল। জাফর তো তবে একটুও মিথ্যা বলে নি। তিনি তার নামে অনর্থক গাল মন্দ করেছেন। আজ সত্যিই তাঁর দর্প চূর্ণ হল।

সরাইয়ের মালিককে ডেকে খলিফা বললেন সমস্ত কথা। তার পর সব কিছু তার কাছে সমঝে দিয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন আবুল কাসেমের কথা। অবাক করলে লোকটা! এমন সব রত্ন অবহেলে দিয়ে ফেললে আরেকজনকে! এ কেমন করে হয়। এ রকম দান ও করে কি করে, এর হদিস জানতেই হবে। ভাবতে ভাবতে খলিফা ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে উঠেই তিনি গিয়ে হাজির আবুল কাসেমের বাড়ি। এত ভোরে খলিফাকে দেখেই কাসেম সাদর অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন, আসুন। আজ্ঞে, আমার কি সৌভাগ্য। একেবারে ভোর হতেই গরিবের গরিব খানায় আপনার পদধূলি পড়ল!"

মহা সমাদরে কাসেম খলিফাকে নিয়ে বসালেন সেই ফরাসের ওপর। তারপর নীচে বসে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। যথা সময়ে খাবার এল। দুজনে একসাথে বসে খাবার খেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর খলিফা বললেন, "কাসেম সাহেব, আপনার অদ্ভুত দান খয়রাৎ দেখে বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার আরো হিসেব করে চলা উচিত।

এভাবে চললে যে বাদশাহের বাদশাহী তোষাখানাও দুদিনে ফাঁক হয়ে যায়।”

মৃদু হেসে আবুল কাসেম বললেন, “সে ভয় করবেন না জনাব। খোদার দোয়ায় আমার ভাণ্ডার অফুরন্ত। হাজার দান খয়রাত করলেও এর কিছু হবে না।” অবাক হয়ে খলিফা বললেন, “বলেন কি জনাব। আপনার কথা যে বড়ই অদ্ভুত শোনাচ্ছে।”

যা বলেছেন জনাব। অদ্ভুতই বটে। কিন্তু কেন যে এ কথা বলছি তার কাহিনী শুনুন। এই কথা বলে আবুল কাসেম তাঁর জীবন কাহিনী আরম্ভ করলেন।



আবুল কাসেমের পূর্ব্ব কাহিনী

আমরা আসলে হচ্ছি মিসর দেশের বাসিন্দা। আমাদের বাড়ী ছিল কায়রো নগরে। আমার বাবা আবুল হাসেম ছিলেন সেখানকার সেরা ধনী সওদাগর। তখন মিসরের সোলতান ছিলেন ফারুক শাহ। ভারী দুর্দ্দান্ত আর অত্যাচারী। তাঁর জ্বালায় কারো ধন দৌলত জমাবার উপায় ছিল না। খবর পেলেই তাঁর লোক এসে জোর করে সব কেড়ে নিয়ে যেত।

এই ভয়ে বাবা করলেন কি, তাঁর ধন দৌলত সব নিয়ে পালিয়ে এলেন বসোরায়। এক ধনী সওদাগরের মেয়েকে বিয়ে করে রয়ে গেলেন এখানে। আমিই তাঁদের একমাত্র ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই অতিরিক্ত আদর পেয়ে আমার মাথা বিগড়ে গেল। যখন যা জিদ ধরতাম, বাবা মা তা পূরণ করতেন—যে রকম করেই হোক। এইভাবে বড় হতে লাগলাম বাপ মায়ের আদরে।

এ সুখ কিন্তু সইল না বেশী দিন। আমি বিশ বছরে পা দিতেই হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। আর আমায় পায় কে! হাতে অগাধ ধন রত্ন। খোলামকুচির মত সুরু করলাম ওড়াতে সাথে এসে জুটলো যত দুষ্ট ইয়ার বন্ধুর দল। মা কত নিষেধ করলেন! কিন্তু কে কার কথা শোনে। দেখতে দেখতে সব ফাঁক। ইয়ার বন্ধুর দলও দে পিঠটান। এই সময় আবার বিপদের উপর বিপদ। হঠাৎ মা ও মারা গেলেন।

চোখে আঁধার দেখলাম। নাঃ, আর এখানে থাকা নয়।

বাড়িখানি বেচে যা পেলাম তাই নিয়ে চলে গেলাম কায়রো নগরে। আমার পূর্ব্ব পুরুষের বাসস্থান এই কায়রো নগর। কত ধন-দৌলত উপায় করে গেছেন তাঁরা এখান থেকে। আর আমি তাঁদেরই বংশধর, ভাগ্যদোষে আজ পথের ভিখারী। ভেবে চোখে জল এসে গেল।

আচকানের হাতায় চোখের জল মুছে চললাম সোজা রাস্তা ধরে। কতদূর চলে এসেছি খেয়াল নেই। হঠাৎ সামনে পড়ল মস্ত বড় এক বাড়ি। কোন বড় লোকের বাড়ি হবে। দাঁড়িয়ে দেখছি বাড়িখানার কারুকার্য্য। হঠাৎ কানে এল হাসির শব্দ মেয়ে কণ্ঠের মধুর হাসি।

বাড়ীর পাশেই মস্ত বড় বাগান, ফল ফুলে ভরা। চাইলাম সেদিক পানে। দেখি কয়েকজন সুন্দরী স্ত্রীলোক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ভেতর। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। কি রূপ! বেহেস্তের হুরীও লজ্জা পায় তার কাছে। চেয়ে রইলাম তার দিক পানে একদৃষ্টে।

আমার বেহায়াপনা দেখে মেয়েটি যেন ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পাশের সখীকে বললেন, "রোশেনারা, ঐ লোকটাকে বল এখান থেকে চলে যেতে।" রোশেনারা তাই করলে। মনোদুঃখে চলে এলাম সেখান থেকে। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারলাম না মেয়েটির সেই অপূর্ব-রূপ।

পরদিন আবার গিয়ে হাজির সেখানে। গিয়ে দেখি ঠিক আগেকার মতই তিনি সখীদের সাথে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি এক সখীর কানে কানে কি যেন বললেন। সখী এসে আমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে। বাগানের মধ্যখানে সুন্দর শ্বেতপাথরে তৈরী একটি কোঠাবাড়ী, কথাবার্ত্তা বলতে বলতে দুজনে গিয়ে ঢুকলাম তার ভেতরে। হঠাৎ পাশের

কামরার দরজা খুলে গেল। চমকে উঠলাম সকলে। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সুলতান নাসির সাহ। ভয়ে শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে পালাতে চেষ্টা করলাম।



"খবর্দ্দার শয়তান! এক পা নড়েছিস কি মরেছিস।" তলোয়াল উচিয়ে গর্জ্জে উঠলেন নাসির সাহ। তারপর মেয়েটির পানে চেয়ে বললেন; "কিরে শয়তানী, এ তোর কে?" মেয়েটির নাম দার্দেনী।

মাথা নুইয়ে দার্দেনী বললে, "শাহনূশা দীন দুনিয়ার মালিক। এ আমার বাপের দেশের লোক। বহুকাল সেখানকার কোন খবর পাইনি। হঠাৎ একে দেখে সেখানকার খবর জানবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। আর কিছু নয়।"

দাঁতে দাঁত কড় মড় রক্তচক্ষু সুলতান বললেন, "মিথ্যেবাদী শয়তানী। তোর বাপের দেশের খবর নেওয়া বের করছি আজ

ভাল করে।"তর তর ধার নাঙ্গা তলোয়ার ঝিলিক্ দিয়ে উঠলো—একেবারে দার্দেণীর মাথার ওপর। ভয়ে আমার চোখ দুটি বুজে এল আপনা আপনি।

"নাঃ, এরকম করে মারবো না তোদের।" তলোয়ার নামিয়ে সুলতান হাঁকলেন, "হামিদ"। "কি হুকুম সাহান শাহ!" হাবসী সর্দ্দার হামিদ এসে দাঁড়াল সুলতানের সামনে। কুর্নীশ করলে মাথা নুইয়ে।

কঠোর কণ্ঠে সুলতান বললেন, "এ দুটোর হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দাও—এক্ষুনি।"

কড়া হুকুম। তক্ষুনি তামিল হয়ে গেল। ছেলে বেলা থেকেই আমি খুব ভাল সাঁতার কাটতে জানতাম। অতি কষ্টে তাই ভেসে রইলাম জলের ওপর। ঢেউয়ের পর ঢেউ আমাকে ঠেলে তুলে দিলে তীরের ওপর। বহু চেষ্টার পর হাত পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। কিন্তু দার্দেনী? তাকে আর দেখতে পেলাম না। হায় আমার জন্যই অকালে তার প্রাণ গেল। মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতর। কেঁদে কেঁদে ছুটলাম পাগলের মত—যে দিক পানে চোখ যায়।

চলতে চলতে হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গেল সামনেই মস্ত বড় এক পাহাড়। বন বাদাড়ে ভরা। সাঁজের আলো তখন প্রায় নিভে এসেছে। পাহাড়ের ভেতর তখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সাহস হলনা আর এগোতে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম খানিক দূরে বয়ে চলেছে সুন্দর একটা ঝরণা। তার দু'ধারে সারি সারি ছোট বড় নানারকমের গাছ। দেখে শুনে একটি বড় গাছের উপর চড়ে বসলাম। রাতটা তো কোন রকমে কাটিয়ে দি। তারপর যা হয় হবে।

শুনলাম কাতর আর্ত্তনাদ। মেয়ে মানুষের গলা। ঐ পাহাড়ের নীচে থেকেই আসছে। এ সময় ওখানে কাঁদে কে! নেমে পড়লাম গাছ থেকে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম সেদিক পানে।

খানিক দূরে একটা খেজুর গাছের ঝোপ। তার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম। একটা লোক যেন কি একটা মাটি চাপা দিয়ে চলে গেল। ভারী সন্দেহ হল লোকটার ওপর। কাউকে খুন করে এখানে গুম করে গেল না ত'। দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে খানিকক্ষণ। কি জানি যদি সে আবার ফিরে আসে। কিন্তু আর ফিরে এল না লোকটা। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে



মাটি সরিয়ে ফেললাম। ওমা এ যে দেখছি একটা কাঠের বাক্স। খুলে ফেললাম বাক্সটা। দেখলাম তার ভেতর শুয়ে আছে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সারা শরীর। পরীক্ষা করে দেখলাম বেঁচে আছে কিন্তু বেহুঁস।

ঝরণার জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম তার চোখে মুখে। কিছুক্ষণ পর সে চোখ মেলে চাইল। তারপর কাতর-কণ্ঠে বললে, "দোহাই খোদার, আর আমাকে মেরো না। তোমার যা ইচ্ছা কর। আমি তাতে কোন বাধা দেব না।"

আমি বললাম, "কোন ভয় নেই বিবি সাহেবা। কেউ তোমাকে আর কিছুই করতে পারবে না।"

কাতর কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "কে তুমি বন্ধু, আমার মৃতদেহে প্রাণ দিলে। খোদা তোমার ভাল করুন।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কাটা যায়গা থেকে রক্ত গড়াতে লাগল দরদর ধারে। তাড়াতাড়ি আমার পাগড়ী ছিঁড়ে আঘাত গুলো বেঁধে দিলাম শক্ত করে। রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম. "বিবি সাহেবা, আপনি কে? কি করে আপনার এ দুরবস্থা হল?"

ধীর কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "সবই জানতে পাবেন জনাব। আগে আমাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন। আঘাতের জ্বালা আর সইতে পারছি না।"

কি আর করা যায়। অতি সন্তর্পণে তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চললাম লোকালয়ের খোঁজে। পাহাড় থেকে ক্রোশ দুই দূরে প্রসিদ্ধ হিসার সহর। অতি কষ্টে গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সামনে একটি সরাইখানা দেখে গেলাম সেখানে। বারান্দায় মেয়েটিকে শুইয়ে রেখে ডেকে তুললাম সরাইয়ের মালিককে। কাঁচা পাকা দাড়ী গোঁফ, প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এলেন তিনি।

আমি তাঁকে সেলাম করে বললাম, "জনাব! বড়ই বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার বোনকে নিয়ে যাচ্ছিলাম

তার শ্বশুর বাড়ি। পথে ডাকাতের হাতে পড়ে আমাদের সর্ব্বস্ব গেছে। বোনটির উপরই জুলুম হয়েছে বেশী। বহু দামী গয়না ছিল তার গায়ে। সহজে সে তা ছাড়তে রাজী হল না। ডাকাতেরা তাকে মেরে আধমরা করে গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আমি তখন তাকে নিয়ে চলে এলাম এখানে। যদি মেহেরবানি করে আমাদের একটু থাকবার যায়গা আর একজন ভাল হেকিমের ব্যবস্থা করে দেন তবে বেঁচে যাই।"

মেয়েটির অবস্থা দেখে মালিকের মন গলে গেল। তক্ষুণি তিনি আমাদের জন্য একখানি ভাল ঘর খুলে দিলেন। তারপর বাকী সব বন্দোবস্ত করে একজন হেকিম ডেকে আনলেন। হেকিম এসেই মেয়েটির আঘাতগুলো পরীক্ষা করে বললেন, "খোদা হাফিজ! আঘাতগুলো তেমন মারাত্মক হয়নি। তবে সারতে একটু সময় লাগবে।" আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। হেকিম তখন মেয়েটির আঘাত গুলোতে মলম লাগিয়ে ভাল করে পট্টি বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন।

পুরো একটি মাস চিকিৎসার পর মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর একদিন আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললো, "ভাই সাহেব! এই সহরের একেবারে শেষে বিখ্যাত ধনী মাহী সাহেবের বাড়ী। তুমি এই চিঠিখানি তাঁর কাছে নিয়ে যাও। আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় আছে। এ বিপদে তিনি আমাদের কিছু না কিছু সাহায্য করবেন-ই।"

মেয়েটির কথা মত আমি মাহী সাহেবের সাথে দেখা করে চিঠি দিলাম। পড়ে সাহেব ত ভারী খুসী। তক্ষুণি দুই তোড়া সোনার মোহর এনে দিলেন আমার হাতে। আর আমাদের যখন যা লাগে যেন তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসি।

মোহর পেয়ে মেয়েটি আমাকে একখানি ভাল দেখে বাড়ি ভাড়া করতে বললে। তক্ষুণি বেরিয়ে একখানি বাড়ি ভাড়া করে এলাম। তারপর সরাইওয়ালার পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে নূতন বাড়ীতে উঠে গেলাম। বাড়িখানি দেখে তো মেয়েটি খুব খুসী। কিছুদিন পর সে আবার আমাকে চিঠি দিয়ে মাহী সাহেবের কাছে পাঠালে। চিঠি পড়ে তিনি আমাকে আট তোড়া মোহর দিলেন। দেখে তো আমার চক্ষু স্থির! কোন বড় ঘরের মেয়ে বোধ হয় এই মেয়েটি। নইলে কার কথায় কে ও রকম মোহর ঢেলে দেয়।

মোহরগুলো এনে মেয়েটির হাতে দিলাম। তা থেকে এক তোড়া সে আমার হাতে দিয়ে বললে, "ভাল ভাল কিছু আসবাব পত্র এনে দাও ত ভাই সাহেব। বাড়ি খানি ভাল করে না সাজালে চলছে না। হাঁ, আর ঐ সঙ্গে কয়েক জন দাস-দাসীরও বন্দোবস্ত করে এসো।

আমি তাই করলাম। বেশ সুখেই কাটতে লাগলো আমাদের দিনগুলো। লোকে জানল আমরা দুই ভাই বোন ভিন দেশ থেকে এসে এখানে বাস করছি।

এইভাবে দিন যায়। একদিন মেয়েটি আমার হাতে কিছু মোহর দিয়ে বললে, "ভাই সাহেব, বাজারের ঠিক মাঝখানে নামারণ নামে এক সওদাগর আছে। মস্ত বড় পোষাকের দোকান তার। সেখান থেকে কিছু পোষাক কিনে আন। হাঁ, আর একটি কথা। জিনিষগুলোর সে যে দাম চাইবে তা দিয়ে দিও। কোন দর দস্তুর করোনা, বুঝলে।"

আমি বেড়িয়ে গেলাম তক্ষুণি। তারপর তার কথামত নামারণের দোকান থেকে জিনিষ কিনে নিয়ে এলাম। দিন কয়েক পর আবার আমাকে সে সেই দোকানে পাঠালে আরো কিছু

পোষাকের জন্য। এবারও সে আমাকে সাবধান করে দিলে। যেন জিনিষের দরদস্তুর না করি। আমিও তাই করলাম।

এইভাবে কিছুদিন পর পরই গিয়ে আমি সেখান থেকে জিনিষ পত্র কিনে আনতে লাগলাম। এমন খদ্দের পেয়ে নামারণের খুসী আর ধরেনা। আরেক দিন জিনিষ কিনতে গেছি। সেদিন সে আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না কিছুতেই। মেয়েটির কাছে এসে বললাম একথা। সে বললে, "এ খুব ভাল কথা। শোন! এবার যেদিন যাবে, তাকে এখানে খানা খাবার নেমন্তন্ন করে এসো। আমি সব যোগাড় যন্ত্র করে রাখব।"

তাই হল, দিন সাত আট পর। আবার জিনিষ কিনতে গিয়ে তাকে আমাদের বাড়ীতে খানা খাওয়ার নেমন্তন্ন করে এলাম। নেমন্তন্ন পেয়ে নামারণ খুসীই হলো। পরদিন রাত্রে দোকানের কাজ শেষ হতেই আমি গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।

আয়োজন বেশ ভালই হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করতে রাত হয়ে গেল অনেক। নামারণ বাড়ি ফিরে যেতে চাইল। মেয়েটি তখন আমাকে ডেকে নিয়ে বললে, "ভাই সাহেব! রাত ত বড় কম হয়নি। সওদাগর সাহেবকে আজ এখানেই থাকতে বল না। ভরা পেটে অনর্থক কষ্ট করে লাভ কি।"

আমি বললাম, "তা মন্দ নয়। তুমি তার ঘুমোবার বন্দোবস্ত কর। আমি গিয়ে বলি তাকে একথা।" নামারণকে গিয়ে বলতেই সে খুসী মনে রাজী হয়ে গেল। আমি তাকে সঙ্গে করে তার ঘুমোবার ঘরে রেখে এলাম। তারপর গিয়ে শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়।

মাঝ রাতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়েই দেখি, পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি।

এ রকম ত হয়নি কখনো। এ সময় ও এখানে কেন? অবাক হয়ে চাইলাম তার পানে। সে বললে, "ঘুম ভেঙ্গেছে ভাই সাহেব? দেখবে এস। নামারণ যেন কি রকম করছে।"

হস্ত দন্ত হয়ে ছুটে গেলাম নামারণের ঘরে। কি সর্বনাশ। ঘর ময় রক্তের ছড়াছড়ি। আর তার মাঝে পড়ে আছে নামারন। একেবারে ফালি ফালি করে কাটা। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো গা। গলা শুকিয়ে কাঠ। অতি কষ্টে সামলে গিয়ে বললাম, "এ কি করে হল বিবি?"



"হিঃ—হিঃ—হিঃ। কি করে হল জানবে? আমি নিজ হাতে খুন করেছি এই শয়তানকে। এই দেখ।" লাল রক্ত মাখা হাত দুখানি তুলে দেখালে সে।

আতঙ্কে উঠে পিছিয়ে গেলাম কয়েক পা। শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, "পাষাণী, কেন ওকে খুন করলি। কি করেছিল ও তোর।"

'কি করেছিল ও আমার? জানতে চাও ভাই সাহেব? তবে শোন।" বলেই মেয়েটি সুরু করলো।

আমি এ দেশেরই সুলতানের এক মাত্র মেয়ে—বড় আদরের। একদিন বাগানে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি। সেই সময় এই নামারণ যাচ্ছিল সেই পথে। কি জানি কেন ওকে দেখেই আমার ভারী ভাল লেগে গেল। স্থির করলাম, ও ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না। কিন্তু সুলতান কি তাতে রাজী হবেন! আমি হলাম তাঁর একমাত্র মেয়ে, আর সে একজন সামান্য সওদাগর।

মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলাম। দিন দিন আমার শরীর শুকোতে লাগল। অস্থির হয়ে উঠলেন সুলতান। বড় বড় হেকিম থেকে ঝাড় ফুঁক, কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু অবস্থা আমার রইল যেই সেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সুলতান।

আমার বুড়ী দাইমা জানত সব। ভয়ে ভয়ে সে গিয়ে একদিন জানালেন সুলতানকে একথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুলতান বললেন, "বেশ তাই হবে। কিন্তু নামারণকে আমার এখানে এসে থাকতে হবে। সুলতানের জামাই হয়ে দোকানে বসতে পারে না। মাঝে মাঝে গিয়ে কেবল দেখাশুনা করতে পারবে মাত্র।"

আমি তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। যথাসময়ে নামারণের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। অনুরোধে সুলতান তার দোকানে কয়েকজন ভাল লোক রেখে দিলেন। বেশ সুখেই কাটতে লাগল আমাদের দিন। মাঝে মাঝে নামারণ গিয়ে তার দোকানের তদারক করে আসত।

একবার ঐ ভাবে তদারক করতে গিয়ে দিন তিন চার পরে

সে বাড়ি এল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ব্যবসায় একটু গোলমাল হয়েছিল। তা মিটাতে গিয়ে ফিরতে এত দেরী হয়েছে।

এইভাবে দিন যায়। আর একদিন নামারণ বেড়িয়ে গেছে দোকান দেখতে। আর ফেরে না। কেমন যেন সন্দেহ জাগলো। দুদিন অপেক্ষা করে একদিন ফকিরের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লাম তাঁর খোঁজে। দোকানে গিয়ে জানলাম সে তার বাড়িতেই আছে। এক আমীরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে আগামী কাল।

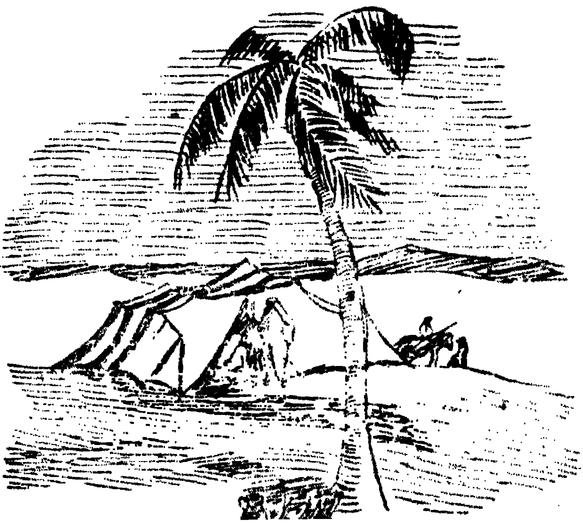
রাগে দুঃখে জ্বলে উঠলো আমার মন। খোঁজ নিয়ে গেলাম তার কাছে। বাড়ির ভেতর ঢুকেই খুলে ফেললাম আমার ছদ্মবেশ হঠাৎ আমাকে দেখে নামারণ যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর সামলে গিয়ে আমাকে নিয়ে গেল একেবারে অন্দরে। জিজ্ঞাসা করলাম তাকে বিয়ের কথা। হেসেই উড়িয়ে দিলে সে আমার কথা। "সব ব্যাটার চোখ টাটাচ্ছে হাসিনা, সামান্য সওদাগর হয়ে একেবারে সুলতানের জামাই হয়েপড়েছি কিনা তাই ঐ সব রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমার নামে। তা করুক না হিংসা যত খুসী, হিংসার আগুনে পুড়ে মরবে নিজেরাই—আমার কি ?"

তারপর আদর করে বললে "এসেই যখন পড়েছো আজ আর গিয়ে কাজ নেই। কাল রাত হলে দুজনেই একসঙ্গে ফিরে যাব। ততক্ষণ আমার এদিকের কাজও শেষ হয়ে যাবে।"

রয়ে গেলাম সেখানে। রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ গলায় চাপ লেগে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি বাঁহাতে নামারণ আমার গলা চেপে ধরে আছে। আর ডান হাত উঁচিয়ে ধরেছে তীক্ষ্ণ ধারাল ছোরা। হঠাৎ এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে গড়িয়ে পড়লাম বিছানার নীচে। তারপর

উঠে ছুটলাম দরজার দিক পানে। দুষ্টও সঙ্গে সঙ্গে এসে আমাকে আক্রমণ করল। দুহাত দিয়ে আটকাতে লাগলাম তার ছোরার ঘা। রক্তে ভেসে গেল সারা শরীর। বেহুঁস হয়ে পড়ে গেলাম মেঝের ওপর। তারপর যা হল আপনি তো নিজেই দেখেছেন। এতদিনে তার প্রতিশোধ নিয়ে আমার মন শান্ত হল।"

যুবতীর কথা শুনে বড়ই কষ্ট হল। আমার জন্যই বেচারী নামারণের এই দশা। মনদুঃখে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে।



আবুল কাসেমের গুপ্তধন

যুবতীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলতে লাগলাম। পথে দেখা হল এক বোগদাদ যাত্রী সওদাগরের সাথে। তার সাথে এসে পৌঁছলাম বোগদাদ সহরে। সঙ্গে আমার তখন সম্বল মাত্র একটি সোনার মোহর। তাই ভাঙ্গিয়ে কিনলাম খানিকটা গোলাপী আতর। সেই আতর বাড়ী বাড়ী ফেরি করে দিন চালাতে লাগলাম।

একদিন এক জায়গায় গিয়ে দেখি কয়েকজন লোক বসে আমোদ আহ্লাদ করছেন। আমি সেখানে গিয়ে আমার বাক্স খুলে বসলাম। ভাল জিনিষ দেখে সকলেই কিছু কিছু কিনে নিলেন। বিক্রি শেষে বাক্স বন্ধ করে উঠে আসছি। পেছন থেকে শব্দ হল, আমি যে বাদ পড়ে গেলাম বাপজান। আমাকেও একটু আতর দিয়ে যাও।" ফিরে দেখি ঘরের কোণে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বয়স এই বছর সত্তর পঁচাত্তরের কম নয়। "একেবারে পেছনে বসে আছেন কিনা তাই দেখতে পাইনি। কিছু মনে করবেন না।" বাক্স খুলে নিয়ে বসলাম সামনে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ আমার মুখের দিক পানে। তারপর বললে, "তোমার দেশ কোথায় বাচ্চা। কার ছেলে তুমি ?" মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল সব কথা। মোচড় দিয়ে উঠল ভেতরটা। সামলে নিয়ে বললাম. "ওকথা জিজ্ঞেস করে আর দুঃখ দেবেন না জনাব। মেহেরবাণি করে কিছু নেবেন ত নিন। আমি চলে যাই।" আর কিছু বললেন না তিনি। একটি সোনার মোহর দিয়ে কিছু আতর কিনে নিলেন।

ভদ্রলোকের ব্যবহারে মনটা ভারী খুসী হয়ে উঠলো। পরদিন আবার গেলাম সেখানে। প্রথমেই বাক্স খুললাম সেই বৃদ্ধের সামনে। কিছু আতর দিয়ে তিনি আজও আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। বাধ্য হয়ে দিতে হল নিজের পরিচয়। সব শুনে



বৃদ্ধ বললেন, "প্রথম দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তোমার বাপ আজিজ ছিল আমার দোস্ত। মায়ের পেটের ভায়ের চেয়েও বেশী। যাক যা হবার হয়ে গেছে। তোমাকে আর আমি এভাবে থাকতে দিতে পারি না। আমার ওখানে নিয়ে যাব। বুড়োকে একটু দেখাশুনা করবে আর কাজ কারবারও শিখবে—কেমন?" খুসী মনে রাজী হলাম তাঁর কথায়।

বৃদ্ধের বাড়ী বাসোরা সহরে। মস্ত বড় ব্যবসায়ের মালিক এখানকার কাজ শেষ করে তিনি আমাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন আর সকলের সামনে পৌষ্যপুত্র বলে গ্রহণ করলেন। বেশ সুখেই কাটতে লাগলো দিনগুলো।

কিছুদিন পরে হঠাৎ

শয্যাশায়ী। বড়বড় হেকিম থেকে শুরু করে ঝাড় ফুঁক। কিছুতেই কিছু হল না। ক্রমেই তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে আসতে লাগল। মৃত্যুর আগের দিন বৃদ্ধ আমাকে ডেকে বললেন, "বাপজান! আমিও চললাম। যাবার আগে তোমাকে একটি কথা বলে যেতে চাই। দেখো যেন কাউকে একথা বলোনা। আমার একটি গুপ্ত ধনাগার আছে। ধনাগারটি অফুরন্ত। পুরুষানুক্রমে এটি আমাদের হেফাজতে আছে। পাছে সুলতান বা তাঁর লোকের নজরে পড়ে যায় এজন্য আমি তা থেকে কোন খরচ করিনি। ওরা জানতে পারলে সব কেড়ে নিয়ে যাবে। তুমিও আমার মত ব্যবসা করেই সংসার চালিও ওতে হাত দিওনা।"

এই কথা বলে বৃদ্ধ তাঁর বালিশের নীচে থেকে একটি চাবি বের করে আমার হাতে দিলেন। তার পর গুপ্ত ধনাগারের রাস্তা বলে চোখ বুজলেন।

পরদিন তাঁর মৃত্যু হল। যথা নিয়মে তাঁর কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরলাম। তারপর গভীর রাত্রে গিয়ে খুললাম সেই ধনাগারের দরজা। যা দেখলাম তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যে দিকে তাকাই শুধু সোনা দানা, হীরে জহরতের ছড়া ছড়ি। কত যে আছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

ভুলে গেলাম বৃদ্ধের কথা। অকাতরে বিলাতে লাগলাম গরীব দুঃখীদের ওর ভেতর থেকে। দুহাত তুলে তারা আমাকে দোওয়া করতে লাগল। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আমার নাম।

একদিন সকাল বেলা বসে আছি। এমন সময় সহর কোতয়াল এসে সেলাম করে বললে, 'জনাব আপনি নিশ্চয়ই

বৃদ্ধের কথাই সত্যি। ওরকম খোলা হাতে খয়রাত করা উচিত হয়নি। কোতোয়ালকে বললাম, "বাপু তোমার আসার কারণ বুঝেছি। এখন কত পেলে খুসী হও বলত ?"

কোতোয়াল বললে, "বেশী নয় জনাব! রোজ দশটি সোনার মোহর পেলেই বর্তে যাই।"

আমি বললাম, "রোজ একশোটি করে মোহর পাবে তুমি আর কোন গোলমাল কোরো না।"

খুসী হয়ে চলে গেল কোতোয়াল। তারপর এল উজিরের পালা। উজিরকে রোজ হাজার মোহর দিয়ে খুসী করতে হল। কিন্তু এতেই পার পেলাম না। উজিরের কাছ থেকে ক্রমে সুলতানও তা' জানতে পেলেন। ডেকে পাঠালেন তিনি একদিন আমাকে। শত অনুরোধ উপরোধেও আমি ধনাগারের হদিস দিলাম না। বললাম, "শাহান শাহ, একথা কাউকে বলতে নিষেধ। আমি বরং আপনাকে রোজ চার হাজার মোহর দিতে রাজী আছি। কিন্তু এর হদিস দিতে পারব না কিছুতেই। অসীম ক্ষমতার মালিক আপনি ইচ্ছা করলে মেরে ফেলতে পারেন আমাকে, মোদ্দা ধনাগারের হদিস পাবেন না।" অগত্যা সুলতান তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। এছাড়া রোজ আমি আরো কত খয়রাত করে থাকি! আপনাকে যা দিয়েছি তা অতি সামান্য। গ্রহণ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না।"

খলিফা বললেন, "গ্রহণ করতে পারি যদি আপনার ধনাগারটি একবার দেখান। খোদার নামে শপথ করে বলছি, আমার দ্বারা আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।"

কাসেম বললেন, "দেখাতে পারি। তবে আমার কথা মত চলতে হবে কিন্তু।" রাজী হয়ে গেলেন খলিফা।

কাসেম বললেন, "বেশ, তাহলে এখানেই খাওয়া দাওয়া

করে আজ থেকে যান। নিশুতি রাতে আপনাকে নিয়ে যাব সেখানে।”

তাই হল। নিশুতি রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাসেম খলিফাকে নিয়ে গেলেন গুপ্ত ধনাগারে, চোখ দুটো রুমাল দিয়ে বেঁধে। দরজা বন্ধ করে কাসেম খলিফার চোখের বাঁধন খুলে দিলেন। মস্ত বড় ঘর। প্রায় সবটা জুড়ে এক প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। সোনার মোহরে ভর্তি। তার চারিদিকে বারটি সোনার বড় বড় থাম। প্রত্যেক থামের উপর একটি করে লাল পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

মোহরের রাশি দেখে খলিফা একেবারে থ। এতবড় বাদশাহীর মালিক, কিন্তু তিনিও জীবনে এত মোহর একসঙ্গে দেখেন নি।

খলিফার অবস্থা দেখে কাসেম বললেন, “দেখছেন কি জনাব! এখান থেকেই আমি রোজ খয়রাত করে আসছি। কিন্তু এক তিল এর কমাতে পারি নি।”

খলিফা বললেন, “তা বটে। কিন্তু যে ভাবে বিলোচ্ছেন একদিন ত শেষ হবেই। তখন কি হবে?”

কাসেম বললেন, “সে জন্য ভাবনা কি জনাব। এর পর আরো অনেক ঘর আছে। এর চেয়েও বেশী দামী জিনিষপত্র আছে তাতে। সেখান থেকে দেবো।”

এই কথা বলে তিনি খলিফাকে নিয়ে গেলেন আর এক ঘরে। আগেরখানার চেয়ে এ ঘর আরো অনেক বড়। তার চারিদিকে ছাদময় সোনা-দানার কারুকার্য। আর মণি-মাণিক্যের ঝালর ঝলমল করছে। এখানেও প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভর্তি কেবল হীরা জহরত মণিমুক্তা রাশি রাশি পড়ে আছে, কত যে তার ইয়ত্তা নাই। খলিফা ভাবেন একি স্বপ্ন না সত্যি!

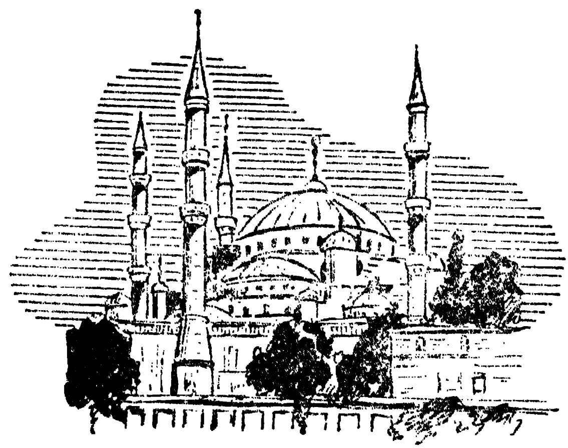
কাসেম খলিফার হাত ধরে নিয়ে গেলেন দুইখানি সিংহাসনের সামনে। সিংহাসনে বসে আছেন এক বাদশাহ আর তাঁর বেগম। পরণে বাদশাহী পোষাক। দুজনেই মৃত, কিন্তু মনে হয় জীবন্ত। কাসেম বললেন, "খোদার কি খেলা দেখুন! এঁরাই ছিলেন এ সব ধন-রত্নের মালিক। কিন্তু এখন?"



খলিফা বললেন, "তা ত বুঝলাম। কিন্তু কোন্ দেশের মালিক ছিলেন এঁরা বলতে পারেন কি?

কাসেম বললেন, "এঁরা ছিলেন প্রাচীন মিশরের বাদশাহ আর বেগম।" তারপর বহু ছোট বড় ঘর দেখিয়ে খলিফাকে নিয়ে গেলেন মস্ত বড় আর একটি ঘরে। কাসেম তাঁকে যে রকম গাছ, ময়ূর, সোনার কাঠি আর পেয়ালা দিয়েছেন, ঐ রকম অজস্র জিনিষ সব বোঝাই করা সেই ঘরে। সমস্ত দেখা শোনা

হলে পর কাসেম খলিফাকে নিয়ে ফিরে এলেন, সেই রকম করে চোখ বেঁধে। তারপর বাঁধন খুলে দিয়ে বসে গল্প-গুজব করতে লাগলেন। ক্রমে রাত ভোর হয়ে গেল। খলিফা কাসেমের কাছে বিদায় নিয়ে সরাইয়ে চলে এলেন। তারপর সমস্ত জিনিষ-পত্র ও লোকজন সহ দেশে ফিরে গেলেন।



উজির ও তাঁর কন্যা

খলিফা চলে যাবার তুদিন পর আবুল কাসেম একটু গোলমালে পড়লেন। সেই যে উজির, যাকে কাসেম রোজ হাজার মোহর পাঠিয়ে দিতেন, তার মনে এক তুষ্টবুদ্ধি জাগল। লোকটা ছিল ভারী লোভী। কাসেমের দেওয়া মোহরে সে মোটেই খুসী হতে পারল না। সমস্ত ধনভাণ্ডারটা পাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু কাসেমটা যে রকম বেয়াড়া! কিছুতেই এর হদিস দিতে চায় না। অন্ততঃ যদি একবার দেখতে পাওয়া যায় তবে এর হয়ত কিছু কূলকিনারা করা যেতে পারে।

ভেবে চিন্তে তুষ্ট এক ফন্দী আঁটলে। তার একমাত্র মেয়ে তুলালী ছিল অপরূপ সুন্দরী। বলখের শাহজাদা আব্বাসের সাথে তার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছিল। উজির করলে কি, তুলালীকে ডেকে বললে, "তুলালী, তোমাকে একবার আজ রাত্রে আবুল কাসেমের বাড়ী যেতে হবে। তার জন্য তোয়ের হয়ে থাকবে।"

"রাত্তের বেলা কাসেমের বাড়ী যাব আমি? কেন বাপজান? কি হবে সেখানে গিয়ে!"—ভয় চকিত কণ্ঠে বললে তুলালী। উজির তখন তার মনের কথা প্রকাশ করে বললে, "তুমি যেচে তার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করলে সে না বলতে পারবে না। তার পর এই সুযোগে তার ধনভাণ্ডার দেখে আসবে, তার পরিমাণ কত।"

তুলালী বললে, "বিয়ের প্রস্তাব করব কি করে বাপজান। আমার বিয়েতো তুমিই ঠিক করে রেখেছ বলখের সাহজাদার সাথে।"

"ভারী বোকা মেয়েত রে তুই। সে সব তো ঠিকই আছে। মিথ্যে করে বলবি আরকি। যাতে করে তার ধনভাণ্ডারটা দেখে আসতে পারিস, বুঝলি না! হেঃ—হেঃ—হেঃ" দাঁত বের করে হাসতে লাগলো উজির।



বেঁকে বসল দুলালী। মিথ্যে করে ওরকম সে কাসেমের বাড়ি যেতে রাজী নয়। তায় আবার রাতের বেলা। "যেতেই হবে তোকে। আমার কথা না শুনলে তোর রক্ষা নেই। ডালকুত্তা দিয়ে তোর হাড় মাঁস ছিঁড়ে খাওয়াব। তবে আমার নাম উজির আব্দুস্ সামাদ।" কি আর করবে—দুলালীকে রাজী হতেই হল।

রাত একটু ঘনিয়ে আসতেই উজির মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এল কাসেমের বাড়ির কাছে। সদর দরজায় ঢুকে দুলালী দারোয়ানকে বললে যে সে কাসেম সাহেবের সাথে দেখা চায়। দারোয়ান তাকে সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিলে।

ধীরে ধীরে দুলালী গিয়ে দাঁড়াল সেই ঘরে। অপরূপ রূপসী দেখে কাসেম ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ফরাস থেকে নেবে এলেন। তারপর মহা সমাদরে দুলালীকে ফরাসে বসিয়ে তার পরিচয় ও এ সময় আসার কারণ জানতে চাইলেন।

দুলালী কাঁদতে কাঁদতে খুলে বললে তার দুঃখের কথা। সবশুনে কাসেম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। টাকার জন্য মানুষ এত পিশাচ হতে পারে এ তাঁর ধারণা ছিল না। যা হোক দুলালীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বোন, আমাকে তোমার বড় ভাই বলেই জানবে। কোন ভয় নেই। চল তোমাকে আমার গুপ্ত ধনাগার দেখিয়ে নিয়ে আসি।" দুলালীর চোখ বেঁধে নিয়ে কাসেম তাকে গুপ্ত-ধনভাণ্ডার দেখিয়ে আনলেন। তারপর রাত ভোর হলে মহা সম্মান করে বিদায় দিলেন। বাড়ী পৌঁছতেই উজির বললে "কিরে, সব দেখে এসেছিস ?"

দুলালী বললে, "হাঁ, সবই দেখে এসেছি। ও ভাণ্ডার থেকে সারা জীবন ভোর খয়রাত করলেও শেষ হবে না। কিন্তু বাপজান তাঁর হীরে জহরতের চেয়েও তিনি অনেক বড়। সে যে কত বড় তা না দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না।" অত সব শুনবার জন্য বয়ে গেছে উজিরের। মেয়ে যে গুপ্ত ধন দেখে এসেছে এই আনন্দেই সে ভরপুর হয়ে গেল।



উজিরের মুক্তি

এদিকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে খলিফা রাজ্যে ফিরে এলেন। তারপর উজির জাফরকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন, "জাফর, তুমি যা বলেছিলে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাস্তবিকই কাসেমের মত লোক দুনিয়ায় দুটি নেই। এ রকম মহৎ লোকের সঙ্গ পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আর এ শুধু তোমারই জন্যে। কিন্তু অনর্থক তোমাকে কষ্ট দিলাম জাফর। এজন্য আমার মনে বড়ই অশান্তি হচ্ছে। কি করলে তুমি খুসী হও বলতো। তুমি খুসী হলেই আমার শান্তি।"

উজির বললেন, "শাহান শাহ, দিন দুনিয়ার মালিক, আমি আপনার সেবক। সেবকের জন্য যে আপনার প্রাণে এত দরদ, এতেই আমি খুসী। আপনি শান্ত হোন।"

খলিফা কিন্তু প্রবোধ মানলেন না উজিরের কথায়। দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। দেখে উজির বললেন, "জাঁহাপনা, আপনার যখন এতেও মন মানছে না, তখন এক কাজ করুন আমার বদলে আবুল কাসেমকে ভাল পুরস্কার দিন এতেই আমি খুসী হব।"

রুমালে চোখ মুছে খলিফা বললেন, "তা যেন করলাম, কিন্তু তাকে কি পুরস্কার দেওয়া যায় বলত।"

উজির বললেন, "জাঁহাপনা, কাসেমকে বাসোরার সুলতানী দিয়ে দিন। এখনকার সুলতান ভারী বদলোক। তার নামে বহু অভিযোগ এসেছে আমার কাছে। ওরকম অত্যাচারী আর বদ মেজাজী লোক রাজ্য চালাবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়।

হুজুরের দরবারে পেশ করবো বলে আমি সব ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু এর মধ্যে ঝাটকা পড়ে গিয়ে তা' আর হয়ে ওঠেনি।"

খুসী হয়ে খলিফা বললেন, "তাই হোক জাফর। তুমি আজই ফরমান পাঠিয়ে দাও, কাসেমের কাছে। আর অমনি বাসোরার সুলতানকে লিখে দাও, আমার হুকুমনামা পাওয়া মাত্রই সে যেন আবুল কাসেমের হাতে রাজ্যভার দিয়ে চলে যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে তামিল হল খলিফার হুকুম। খলিফার হুকুম-নামা পেয়ে বাসোরার সুলতানের মাথা ঘুরে গেল। উজির আব্দুস্ সামাদকে ডেকে পাঠালেন সুলতান তক্ষুণি। উজির এসে সমস্ত দেখে শুনে বললে, "তাইতো হুজুর, বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি। আপনার বিপদে যে আমারও সর্ব্বনাশ।" সুলতান বললেন, "সর্ব্বনাশ বলতে সর্ব্বনাশ, একেবারে পথের ফকির। কিন্তু কি করে বাঁচা যায় উজির তার একটা ফিকির বের কর।"

উজির বললে, "এমনভাবে কাজ করতে হবে হুজুর যাতে করে সাপ মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না। খলিফার দূতকে দুদিন অপেক্ষা করতে বলুন। এর মধ্যে যা করবার আমি করে দিচ্ছি।"

সুলতানের অনুরোধে দূত রইল বসোরায়। আর উজির করলে কি, কয়েকজন ওমরাহকে নিয়ে গেল আবুল কাসেমের বাড়ি। তাদের দেখে কাসেমত খুব খুসী। মহাসমাদরে তিনি সকলকে অভ্যর্থনা করলেন। পরিচারকরা খাবার নিয়ে এল। আবুল কাসেম সকলের সাথে খেতে বসে গেলেন। খাওয়ার সাথে চলল হাসি ঠাট্টা আর গল্প। হাসি গল্পে যখন সব্বাই মশগুল, তখন দুষ্ট উজির করলে কি—আবুল কাসেমের সরবতের ভেতর মিশিয়ে দিলে একরকম সাদা গুঁড়া। সরবত খাওয়ার সাথে সাথে কাসেম ত একেবারে বেহুস।

দেহে যেন প্রাণ নেই। সকলে হাহাকার করে উঠলো। পরিচারক পরিচারিকারা প্রাণপণে সেবা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাড়িময় উঠলো কান্নার রোল। গরীবের মা বাপ আবুল কাসেম আর ইহজগতে নাই। খবর শুনে দলে দলে লোকজন ছুটে আসতে লাগল কাঁদতে কাঁদতে।



খুসীতে ভরে উঠলো দুষ্ট উজিরের মন। কিন্তু লোক দেখিয়ে সেও সুরু করলে দারুণ কান্না। বুক চাপড়ে, দাড়ি ছিঁড়ে, ভুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচাতে লাগলো। কিছুক্ষণ এই রকম লোক দেখান কান্নাকাটি করে উজির আবুল কাসেমের কবর দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

লম্বা একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে কাসেমকে পুরে গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে গোর দিয়ে আসা হল। রাত দুপুরে উজির করলে কি, দুজন লোক নিয়ে গেল সেই গোরস্থানে। তারপর কাসেমকে বাক্সের ভেতর থেকে বের করে গরম জলে স্নান

করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাসেমের হুঁস ফিরে এল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "আমি কোথায়?" উজির বললেন, "গোরস্থানে। কাসেম যদি বাঁচতে চাও ত তোমার ধনভাণ্ডার কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। নইলে রক্ষা নাই।"

কাসেম বললেন, "ভুল করছো উজির। আমাকে মেরে ফেললেও তার সন্ধান দেব না। তোমার যা খুসী করতে পার।"

দুষ্ট উজির তখন তাঁকে মারতে মারতে বেহুঁস করে ফেললে। তারপর আবার বাক্স বন্দী করে গোর দিয়ে চলে গেল। দেখতে দেখতে দুদিন কেটে গেল। খলিফার দূতকে তো চিঠি দিতে হবে। সুলতান আর উজির যুক্তি করে চিঠি লিখল যে মহামান্য খলিফার হুকুম তামিল করতে না পারায় আমরা দুঃখিত। কারণ সুলতান হওয়ার খবর পেয়েই আবুল কাসেম আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো, আর এনতার সরাব খেয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে মারা গেল। এমতাবস্থায় কি করা তাহাদের জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। চিঠি নিয়ে দূত চলে গেল।

পরদিন উজির আবার গেল সেই গোরস্থানে। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! কবর খুঁড়ে দেখে বাক্স খোলা। কাসেম নেই তার ভেতর। হতবুদ্ধি উজির কাঁপতে কাঁপতে ছুটলো সুলতানের কাছে। সব শুনে সুলতান ত' একেবারে থ। গলা শুকিয়ে কাঠ। "সর্ব্বনাশ হল উজির। নিশ্চয়ই কেউ তাকে সরিয়ে ফেলেছে সেখান থেকে। খলিফার কাছে একথা যাবেই। তখন আর রক্ষার উপায় থাকবে না। তোমার কথা শুনে আমার আর বাঁচবার উপায় রইল না।" অঝোরে কাঁদতে লাগলেন সুলতান বুক চাপড়ে।

দুষ্ট উজির বললে, "আফশোষ করে সময় নস্ট করে লাভ নেই জাঁহাপনা। দু-দল সেপাই নিয়ে বেরিয়ে পড়া

যাক এক্ষুনি। পালিয়েছে বটে কাসেম কিন্তু এখনো বেশী দূর যেতে পারেনি।

এদিকে দূতের দেরী দেখে খলিফা উজির জাফরকে পাঠিয়ে দিলেন বাসোরায়। সেপাই শান্ত্রী নিয়ে জাফর চলেছেন সেখানে। মধ্য পথে দূতের সাথে দেখা। উজিরকে দেখেই দূত আফশোষ করে বললে, "কেন আর যাচ্ছেন উজির সাহেব। কাসেম সাহেব আর বেঁচে নেই।"

স্তব্ধ হয়ে গেলেন জাফর, "বল কি দূত? হঠাৎ তিনি মারা গেলেন কি করে?"

দূত বললে, "তা ত জানিনে হুজুর। খলিফার চিঠি পেয়ে সুলতান আমাকে দুদিন অপেক্ষা করতে বললেন। এর মাঝে হঠাৎ যে কি হয়ে গেল বুঝলাম না। তবে নিজে আমি তাঁকে গোর দিতে দেখে এসেছি।"

কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো জাফরের চোখ বেয়ে।

খানিকক্ষণ চুপ করে তারপর ফিরে চললেন খলিফার কাছে, সব্বাইকে নিয়ে। সমস্ত শুনে খলিফা বললেন, "অসুখ নেই বিসুখ নেই হঠাৎ মারা গেল লোকটা।" তারপর চিঠি পড়ে তাঁর বিষম সন্দেহ হল। মদ খেয়ে বেহুঁস হবার লোক নয় আবুল কাসেম। এ নিশ্চয়ই সেই দুষ্ট সুলতানের কাজ। জাফর আরও সেপাই শান্ত্রী নিয়ে তুমি এক্ষুনি বাসোরা যাও। দুষ্ট সুলতান আর উজিরকে হাত পা বেঁধে হাজির কর আমার দরবারে। হুকুম পেয়ে উজির চলে গেলেন।

ওদিকে হয়েছিল কি, যেদিন দুষ্ট উজির কাসেমকে বাক্স বন্দী করতে চলে গেল, মাঝ রাতে উজিরের মেয়ে দুলালী এল সেখানে। সঙ্গে তার ভাবী স্বামী বলখের যুবরাজ আলী। দুজনে কাসেমকে বাক্স থেকে বের করে নিয়ে লুকিয়ে

রাখলেন এক যায়গায়। তাঁদের যত্নে কাসেমের হুঁস ফিরে এল।

এ রকম দানবের ঘরেও এমন দেবী প্রতিমার জন্ম হয়! ছল ছল চোখে কাসেম তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। দুলালী বললে, "ভাইসাহেব, সেদিন আপনার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি তার যে কিছুও প্রত্যুপকার করতে পারলাম সেজন্য খোদাকে ধন্যবাদ। এজন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন কারণ নেই। এখন ভালোয় ভালোয় আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বাঁচি।"

দিন দুই তিন পর আবুল কাসেম সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর দুলালীর কথামত রাত্রিবেলা বেরিয়ে পড়লেন ছদ্ম-বেশে বাগদাদের পথে।

পথে যেতে যেতে কাসেম ভাবলেন, সেই যে সওদাগর এসেছিলেন তাঁর সাথে দেখা করতে, তিনি তো বলেছিলেন বাগদাদেই তাঁর বাড়ি। তাঁকে খুঁজে বের করে আশ্রয় নিতে হবে সেখানে। তারপর যা হয় খোদার মর্জি। তিন দিন পর কাসেম এসে পৌঁছুলেন বাগদাদে। খুঁজতে লাগলেন সেই সওদাগরকে সহরের চারিদিকে। কিন্তু পাবেন কোথায়? তিনিই যে স্বয়ং খলিফা 'হারুণ অল্ রসিদ' এ কথা ত' আর কাসেম জানেন না।

চারিদিকে খোঁজা খুঁজি করে কাসেম হয়রাণ হয়ে পড়লেন। সামনেই মস্ত বড় এক কোঠা বাড়ি দেখে তারই ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এই বাড়ি খানা হল স্বয়ং খলিফার মহল। পেয়ালা সমেত যে ছেলেটিকে তিনি খলিফাকে দিয়েছিলেন সে তেতলার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখছিল চারিদিক। হঠাৎ কাসেমের উপর নজর পড়তেই সে চমকে উঠলো।

"তাইত এ যে দেখছি আমার মনিব আবুল কাসেম! কিন্তু এঁর এ বেশ কেন?" ছুট্টে নেবে এলো ছেলেটি। দোতলায় নেবে আবার দেখল ভাল করে। "তাইত" এ যে দেখছি কাসেম সাহেবই।"

আনন্দে অধীর হয়ে সে ছুটে গেল খলিফার কাছে, "জাঁহাপনা, কাসেম সাহেব মারা যাননি মোটেই। ঐ যে ছায়ায় বসে আরাম করছেন। আমি এইমাত্র দেখে এলাম।"

অবাক হয়ে গেলেন খলিফা। বললেন, "বলিস কিরে, কাসেম সাহেব বেঁচে আছেন? লোকের মত লোক ত' দেখা যায় অনেক সময়। তুই হয়ত আর কাউকে দেখে ভুল করেছিস।"

ছেলেটি বললে, "না শাহন শাহ, আমার মোটেই ভুল হয়নি। একেবারে ছোট্টটি থেকে আছি কিনা তাঁর কাছে। সত্যি করে বলতে পারি, ইনি আমার মনিব কাসেম সাহেব ছাড়া আর কেউ নন।"

খলিফা তক্ষুণি একজন লোক সঙ্গে দিয়ে ছেলেটিকে বললেন, "শীগ্‌গির ছুটে যা। যদি দেখিস তিনি সত্যই কাসেম সাহেব, সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবি।"

লোকটিকে নিয়ে ছেলেটি ছুটে গেল একেবারে আবুল কাসেমের সামনে। হঠাৎ তাকে দেখে আবুল কাসেম অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি এখানে এলে কি করে বাপজান? তোমার সেই সওদাগর সাহেবকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি। কোথাও তাঁর পাত্তা পেলাম না।"

খুসীতে গলে গিয়ে ছেলেটি বললে, "হুজুর, পাবেন কি করে! তিনি ত আর সত্যি সত্যি সওদাগর নন। স্বয়ং খলিফা

ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন আমাদের ওখানে। তাঁকে আমি আগেই জানিয়েছি আপনার কথা। আপনি বেঁচে নেই শুনে তিনি ভারী মুষড়ে পড়েছিলেন। এখন বেঁচে আছেন জেনে তেমনি খুসী হয়েছেন। আর আমাদের দুজনকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।"



ছেলেটির কথায় খুসী হয়ে আবুল কাসেম খলিফার সঙ্গে দেখা করলেন। "খোদাকে অজস্র ধন্যবাদ, মহাত্মা আবুল কাসেম তুমি বেঁচে আছ।" আনন্দে অধীর হয়ে খলিফা বুকে জড়িয়ে ধরলেন কাসেমকে। দুজনের চোখেই অশ্রু ধারা।

কিছুক্ষণ পর দুজনে শান্ত হয়ে বসলেন ফরাসের উপর। খলিফা খুঁটে খুঁটে জেনে নিলেন সব কথা কাসেমের কাছ থেকে। তারপর দুঃখ করে বললেন, "কাসেম, এজন্য আমিই দায়ী। আগে থেকে জাফরকে পাঠিয়ে সব কাজ করালে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আমি জাফরকে পাঠিয়েছি বাসোরায়। সে না ফেরা তক আমার এখানেই থাক।" এই কথা বলে খলিফা কাসেমকে নিয়ে তাঁর বাগান বাড়ি চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দুজনে নাওয়া খাওয়া করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলেন।

বেলা ক্রমে পড়ে এল। খলিফা কাসেমকে নিয়ে গেলেন অন্দর মহলে। বেগম জেবেদী সেখানে বসে গান শুনছিলেন। অপরূপ রূপবতী এক যুবতী মাঝখানে বসে গান গাইছিল। আর তার সাথে সঙ্গত করছিল, বেগমের কয়েকজন সুন্দরী সখী।

খলিফা বেগমের সাথে আবুল কাসেমের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আবুল কাসেমও কুর্ণীস করলেন বেগমকে ভূঁয়ে লুটিয়ে। কাসেম সাহেব বেঁচে আছেন দেখে বেগমও খুব খুসী। সস্নেহে তাঁকে বললেন, "আপনি বেঁচে আছেন, খোদাকে ধন্যবাদ। এখন শাহান শার সাথে বসে একটু গান বাজনা শুনুন।"

খলিফা গিয়ে বসলেন বেগমের পাশে সোনার খাটে আর আবুল কাসেম বসলেন মেজেয় গালিচার ওপর। মধুর কণ্ঠে গান চলতে লাগল। গান গাইতে গাইতে সেই যুবতীর নজর পড়ল আবুল কাসেমের উপর। অমনি গান গেল থেমে। "ওঃ" কাতর আর্তনাদ করে যুবতী লুটিয়ে পড়লো গালিচার ওপর। সবারে বেহুঁস।

"কি হল! কি হল!" সকলে ছুটে এল তাকে দেখতে।

বেগম জেবেদী এসে সস্নেহে তার মথো কোলে তুলে নিলেন। "জল আন, হাওয়া কর।" ছুটাছুটি পড়ে গেল চারিদিকে।

খালিফাও ছুটে গেলেন সেখানে। দেখাদেখি আবুল কাসেমও গেলেন দেখতে। কিন্তু যুবতীকে দেখেই তিনিও কাতর আর্ত্তনাদ করে পড়ে যান আর কি। পাশেই ছিলেন খলিফা। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন। তারপর জল হাওয়া করে দুজেনরই আবার হুঁস হল।

খলিফা কাসেমকে বললেন, "আবুল কাসেম, তোমরা দুজনেই দুজনকে দেখে ওরকম কবলে কেন? আগে থেকেই তোমদের জানা শোনা আছে নাকি?" কুর্ণীস করে কাসেম বললেন, "জাঁহাপনা, আপনার কাছে যে কায়রো নগরীর কাহিনী বলেছিলাম, এ সেই সুন্দরী দার্দেনী। হঠাৎ দেখে আব সামলাতে পারনি নিজেকে। বেয়াদবি মাফ করতে হুকুম হয়।"

খলিফা দার্দেনীকে জিজ্ঞেস কবলেন, "সমুদ্র জল থেকে বাঁচলে কি করে দার্দেনী?"

দার্দেনী বললে, "জেলেদের জালে আটকা পড়ে বেঁচে গেছি জাঁহাপনা। তারাই আমাকে এনে এক দাস বিক্রেতার কাছে বিক্রী কবে দেয়। সেই দাস বিক্রেতার মাবফত আসি হুজুরের হারেমে।"

খলিফা বললেন, "খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ। তোমাদের দুজনকে আবার একত্র মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের দুজনের বিয়েটা এখন হয়ে গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়। কি বল জেবেদী?" হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেন খলিফা বেগমকে। জেবেদী বললেন, "শাহান শাহের ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। আমারও তাই ইচ্ছা।"

আবুল কাসেম আর দার্দেনী কুর্ণীস করলো খলিফা আর বেগমকে, পাশাপাশি হাটু গেড়ে। দুজনেই খুসী মনে আশীর্ব্বাদ করলেন তাঁদের।



যথা সময়ে আবুল কাসেমের সাথে দার্দেনীর বিয়ে হয়ে গেল। রাজধানীতে উৎসবের ধূম চলল, সাতদিন সাত রাত্তির ধরে।

তিন দিন পর জাফর দুষ্ট আব্দুস্ সামাদকে বন্দী করে

নিয়ে এলেন। সুলতান আত্মহত্যা করে রক্ষা পেলেন। আব্দুস্ সামাদকে দেখেই খলিফা একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দ্দানের হুকুম হয়ে গেল। হাবসী জল্লাদ আব্দুস্ সমাদকে টেনে নিয়ে গেল কোতল খানায়।

সহরের লোক ভেঙ্গে পড়লো দুষ্টের শাস্তি দেখতে। খলিফাও গেলেন সেখানে। সঙ্গে উজির জাফর আর আবুল কাসেম। খোলা তলোয়ার হাতে জল্লাদ গিয়ে দাঁড়াল আব্দুস সমাদের পেছনে। খলিফা হুকুম দিতে যাবেন। এই সময় আবুল কাসেম তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, "জাহাপনা উজির আব্দুস্ সামাদ আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সত্যি। কিন্তু ওকে প্রাণে না মেরে অন্য শাস্তি দিন। আমার জন্য একজনের প্রাণ যাবে এ আমার সহ্য হবেনা মোটেই।" মুগ্ধ হয়ে গেলেন খলিফা। এ মানুষ না দেবদূত! মানুষে এত গুণ সম্ভবে না কিছুতেই। খুসী হয়ে বললেন, "সাবাস আবুল কাসেম, এ কেবল তোমাতেই সম্ভব।"

তারপর আব্দুস্ সামাদকে বললেন, "দেখলি শয়তান! যাঁকে তুই প্রাণে মারবার তালে ছিলি, তিনিই তোর প্রাণ রক্ষা করলেন। তোকে চির নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আমার রাজ্যে আর তোর স্থান নেই। এক্ষুণি বেরিয়ে যা। দূর হ!" সহর কোতোয়াল আব্দুস্ সামাদকে নিয়ে চলে গেল।

আবুল কাসেম তখন খলিফাকে বললেন, "শাহানশাহ, গোলামের বেয়াদবি মাপ করতে হুকুম হয়। বসোরার সুলতানী দুলালীর স্বামী আলী সাহেবকে দিলে বড়ই খুসী হই। এরা দুজন না হলে আমার প্রাণ বাঁচত না। তাই পুরস্কার এদেরই প্রাপ্য। আমার নয়।"

তাই হল। মহা সমারোহে আলী বসোরার তখ্‌তে

বসলেন। কয়েকদিন পর আবুল কাসেম দার্দেনীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন এবং মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

ফতিমার গল্প শেষ হলে শাহাজাদীর সখীরা আবুল কাসেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। কিন্তু শাহাজাদী চুপ করে রইলেন। ফতিমা বুঝলো আবুল কাসেমের গল্প মোটেই তাঁর মনে লাগেনি। তাই সে আর একটি গল্প আরম্ভ করলো।



চিরস্থানীর কাহিনী

পারস্যের বাদশাহ শাহ আলতাফ। যেমন রূপ তেমন গুণ। আর তেমনি ছিল তাঁর যুদ্ধ করবার ক্ষমতা। তরুণ বয়স। বিয়ে হয়নি এখনো। মনের মতন মেয়ে না পেলে বিয়ে করবেন না। এই বাদশাহের ইচ্ছা। বাদশাহের আবার শিকার খেলার ভারী ঝোঁক। কিছুদিন পর পরই তিনি দলবল নিয়ে শিকারে যান জঙ্গলের মধ্যে।

একবার শিকারে গিয়ে বাদশাহ দেখলেন। বনের ভেতর দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত রঙের হরিণ। তার সমস্ত শরীর গাঢ় নীল। আর তাতে সোনার ফুট্‌কী জ্বল জ্বল করছে। যেন আকাশের তারা। তাঁদের দেখেই হরিণটা একলাফে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেল। বাদশাহ তার পেছন পেছন ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। প্রধান উজির হানিফ ছিলেন সাথে। বাদশাহের পেছনে তিনিও ছুটলেন ঘোড়া নিয়ে। লোকজন রইল সেখানে পড়ে।

ছুটতে ছুটতে দুজনে এসে বেরোলেন এক নদীর ধারে। দেখেন সেই হরিণটা শুয়ে আছে এক ঝোপের নীচে। ধনুকে তীর লাগিয়ে তাক করলেন বাদশাহ। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা এক লাফে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। আর দেখা গেল না। হাতের অস্ত্র হাতেই রইল। বাদশাহ, উজির দুজনই একেবারে বেকুব বনে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বাদশাহ উজিরকে বললেন, "উজির তুমি সিপাহীদের নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাও। আমি এখানে বসে পাহারা দেব। দেখি হরিণটা ওঠে কিনা।" উজির রাজী

হলেন না বাদশাহকে একা ছেড়ে যেতে। দুজনেই বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেখানে। ক্রমে রাত হয়ে এল। বসেই আছেন ঠায় দুজনে। কিন্তু কোথায় হরিণ। পাত্তাই নাই তার।



বসে বসে দুজনে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে পারেন না। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম গেল ভেঙ্গে। "ভারী সুন্দর গান বাজনার শব্দ আসছে না!" অবাক হয়ে গেলেন বাদশাহ। এমন মিষ্টি সুরে গান বাজনা করে কে এই বনের ভেতর! উঠে দাঁড়ালেন দুজনে। এগিয়ে চললেন শব্দ লক্ষ্য করে, ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে।

খানিক দুর যেতে না যেতেই দেখেন সামনে মস্ত বড় এক শ্বেত পাথরের বাড়ি। লাল, নীল, সবুজ নানা রঙের আলোয় আলোময়। ঝলমল করছে বাড়িখানি যেন বেহেস্ত। গান বাজনা হচ্ছে ওরই মধ্যে।

বাদশাহ বললেন, "উজির, চলত দেখি কারা ওখানে এমন সুন্দর গান বাজনা করছে। উজির আপত্তি তুললেন। কি জানি কি। জীন পরীর কাজ হয়ত। নইলে কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এখানে এসব এল কোত্থেকে। দিনের বেলাতে দেখতে পাওয়া যায়নি কিছুই। বাদশাহ নাছোড়বান্দা। যাবেনই তিনি ওখানে। হোকনা জীন পরী কি করবে তাঁর!

কি আর করা! রাজী হতে হল বাদশাহের কথায়। দুজনে গিয়ে দাঁড়ালেন বাড়িটার সামনে। খোলাই ছিল সদর দরজা। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঢুকে পড়লেন তাঁরা দরজা দিয়ে। দরজা পার হয়ে প্রকাণ্ড উঠান। তারপর মস্ত বড় মহল। সোনা রূপা হীরা মাণিকের কাজ মহলের চারিদিকে।

উঠান পার হয়ে দুজন গিয়ে উঠলেন মহলের বারাণ্ডায়। সেখান থেকে দেখতে পেলেন। মস্ত বড় একখানি ঘর। ঘর জুড়ে প্রকাণ্ড ফরাস। ফরাসের উপর নরম মখমলের গদি। সোনার কাজ করা গদি ঝলমল করছে, ঝাড়বাতির আলোয়। গদির ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে এক পরমা সুন্দরী যুবতী। তার চার পাশে বসে গান করছে তার সখীরা। কয়েক-জন বাজাচ্ছে বাঁশী আর রাবাব, গানের সাথে সাথে।

ব্যাপার দেখে দু'জনেই অবাক। তাঁদের দেখেই যুবতী গান বাজনা বন্ধ করে দিলেন। তারপর মহা সমাদরে দুজনকে নিয়ে বসালেন ফরাসের উপর। সখীদের কেউ নিয়ে এল ভাল খাবার। আবার কেউ দাঁড়িয়ে তাঁদের বাতাস করতে লাগল।

যুবতীর আদর যত্নে খুসী হয়ে বাদশাহ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। যুবতী বললে, "জঁাহাপনা, আপনি যার পিছু নিয়েছেন। আমিই সেই হরিণী।"

বাদশাহ বললেন, "হরিণী ? তবে তোমার প্রকৃত পরিচয় কি ?"

যুবতী বললে, "সাত সমুদ্দুরের মাঝখানে চিরস্থান দ্বীপ। দৈত্যদের দেশ সেটা। সেখানকার বাদশাহের একমাত্র মেয়ে আমি। মাঝে মাঝে আমি বেরিয়ে পড়ি দেশ ভ্রমণে। একমাত্র আদুরে মেয়ে বলে বাপ মাও তাতে বাধা দেন না মোটেই। কত দেশ বিদেশ ঘুরে দেখলাম। কাউকে চোখে লাগলো না। কিন্তু কাল আপনাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। দৈত্য জাতির মেয়ে কি না, আমরা নানা রূপ ধরতে পারি। তাই বিচিত্র হরিণীর রূপ ধরে আপনাকে নিয়ে এলাম এখানে। এখন যদি মেহেরবাণী করে চরণে স্থান দেন বর্তে যাই চিরকালের মত।"

দুজনে কথা বার্তা হচ্ছে এইভাবে। এমন সময় এক দৈত্য কন্যা এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো চিরস্থানীর সামনে। দু'চোখ বেয়ে পড়েছে তার অশ্রুজল। দৈত্য কন্যা ভারী ভয় পেলো।

শুষ্ক কণ্ঠে বললে, "কি রে নাহরিণ খবর কি ? তোর চোখে জল কেন ?"

চোখের জল মুছে নাহরিণ বললে, "শাহজাদী, মন শক্ত করুন। আপনার বাবা আমাদের মালিক আর বেঁচে নেই।"

কেঁদে লুটিয়ে পড়লো চিরস্থানী, পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে। এই সময় ঘরে ঢুকলো কয়েকজন বৃদ্ধ দৈত্য। পরণে তাদের জমকালো পোশাক। তারা এসেই চিরস্থানীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "অনর্থক কান্নাকাটি করে লাভ কি শাহজাদী। বাপ মা কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে। শান্ত হয়ে চলুন। আপনাকেইত এখন তখ্‌তে বসতে হবে।"

চোখের জল মুছতে মুছতে চিরস্থানী বাদশাহকে বললে,

"শুনলেন তো জাঁহাপনা আমার অবস্থা। আমাকে দেশে যেতে হবে এক্ষুণি।"

ধরা গলায় বাদশাহ বললেন, "সুন্দরি! তোমাকে পেয়েও আমার পাওয়া হলনা। আমার এখনো বিয়ে হয়নি। ভেবেছিলাম



তুমি গিয়ে আমার অন্দর আলো করবে। কিন্তু হতভাগ্য যে তার কপালে এত সুখ সইবে কেন।" কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তাঁর চোখ বেয়ে।

চিরস্থানী বললে, "দুঃখ করবেন না শাহান শাহ। আমার

উপর যদি আপনার সত্যি সত্যি টান থাকে তবে আবার দেখা হবে।

চিরস্থানী চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ি ঘর সব কোথায় মিলিয়ে গেল। চারিদিকে কেবল বন আর বন। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অতি কষ্টে দু'জন বেরিয়ে এলেন নদীর তীরে, বন বাদাড় ভেঙ্গে। দেখতে দেখতে রাত ভোর হয়ে এল। দু'জনে ফিরে এলেন রাজধানীতে। কিন্তু বাদশাহের মনের শান্তি চলে গেল। কাজ কর্মে মন লাগে না। দিন রাত কেবল চিরস্থানীর চিন্তা।

বাদশাহের অবস্থা দেখে উজির বললে, "অনর্থক চিন্তা করে শরীর খারাপ করবেন না জাঁহাপনা। আমরা যে ভালয় ভালয় সেদিন ফিরে এসেছি এই আমাদের জোর বরাত। যাদুকরীর গল্প শুনেছি বটে, কিন্তু সেদিন বিবাদ মিটে গেল চোখ কানের। আমার একান্ত প্রার্থনা মুছে ফেলুন ওসব কথা মনের ভেতর থেকে।"

বাদশাহের মন শান্ত হলনা কিছুতেই। চিরস্থানীর কথা ভেবে ভেবে শরীর কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। যেখানে চিরস্থানীর দেখা পেয়েছিলেন কয়েক দিন পর পরই সেখানে গিয়ে দেখতে লাগলেন সে আসে কিনা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। বাদশাহ তখন উজিরের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন চিরস্থানীর খোঁজে। দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন তিনি ঘোড়ায় চেপে। কিন্তু কোথাও পেলেন না চিরস্থানীর খোঁজ।

না পেলেও হাল ছাড়লেন না বাদশাহ। ঘুরে ঘুরে এসে উপস্থিত হলেন তুরফান রাজ্যের সীমায়। সেখানে দেখলেন এক পরমা সুন্দরী যুবতী এক গাছতলায় বসে কাঁদছে।

বাদশাহ তার কাছে গিয়ে বললেন, "বিবিসাহেবা, আপনি কে?. এখানে এরকম বসে কাঁদছেন কেন?"

চোখের জল মুছে যুবতী বললে,"জনাব, আমি আফগানিস্থানের আমীর মীরণ শাহের মেয়ে। একমাত্র সন্তান বলে বাবা বড় আদর করতেন আমাকে। চোখের আড়াল করতেন না এক তিলও। এত সুখ আমার কপালে সইল না। আমার বয়স যখন দশ বছর, হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। অল্পবয়সে পিতৃহীনা হয়ে একেবারে মুষড়ে পড়লাম।

বাবার প্রধান উজীর আলী মোহাম্মদ আমাকে বড় স্নেহ করতেন। তাঁর সান্ত্বনায় মন স্থির হল অনেকটা। কিছু শান্ত হলে পর তিনিই চেষ্টা করে আমাকে তখ্‌তে বসালেন। দিন কাটতে লাগল এক রকম। কিন্তু এমন পোড়া ভাগ্য আমার! কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার এক নূতন বিপদে পড়লাম। আমার বাবার এক ভাই ছিলেন। তাঁর নাম মোয়াফেক। বাবা বেঁচে থাকা সময় একবার মোগলেরা আমাদের দেশ আক্রমণ করে। চাচা মোয়াফেক বহু সৈন্য নিয়ে গেলেন তাদের বাধা দিতে। ভারী লড়াই হল দুপক্ষে। মোগলেরা পালিয়ে গেল বেদম মার খেয়ে। কিন্তু চাচার খোঁজ পাওয়া গেল না। সকলেই ধরে নিলেন যে চাচা মারা গেছেন। এতদিন পরে ফিরে এলেন সেই চাচা।

আমাকে তখ্‌তে দেখে তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। "মেয়েরা আবার রাজ্য চালাবে কি? আমি যখন ফিরে এসেছি। আমাকেই তখ্‌ত দিতে হবে।"

বৃদ্ধ উজির তাঁকে কত বুঝালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সমস্ত ওমরাহদের হাত করে তখ্‌ত দখল করে বসলেন। আমি যা ছিলাম তাই হলাম আবার। এত করেও কিন্তু চাচার সাধ মিটলো না। আমাকে খুন করবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

বেগতিক দেখে উজির আমাকে নিয়ে পালিয়ে এলেন এই তুরকান রাজ্যে। উজিরের একটা গুণ ছিল। তিনি চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন। এখানে এসে তিনি ছবির ব্যবসা সুরু করলেন। দেখতে দেখতে চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। রাজ্যের সুলতান তো একদিন নিজেই এসে হাজির আমাদের বাড়ি। মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন উজির তাঁকে। ভাল ভাল ছবি সব খুলে দেখালেন।

ছবি দেখে সুলতান ভারী খুসী। খান পাঁচেক ছবি কিনে নিলেন সুলতান, বেশ দাম দিয়ে।

এদিকে হয়েছিল কি ; ঐ সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সুলতান মুগ্ধ হয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন। বৃদ্ধ উজির তো খুব খুসী। রাজী হয়ে গেলেন সুলতানের কথায়। যথা সময়ে সুলতানের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমি হয়ে গেলাম তুরকান রাজ্যের বেগম। বেশ সুখেই দিন কাটতে লাগল।

বৃদ্ধ উজির সুযোগ পেয়ে একদিন সুলতানের কাছে খুলে বললেন আমার জীবন কথা। শুনে সুলতান গেলেন বেজায় রেগে। বিরাট সৈন্য বাহিনী জড় করে দূত পাঠালেন মোয়াফেকের কাছে। স্ব-ইচ্ছায় যদি তখ্‌ত ছেড়ে দেয় তবেত কথাই নেই। নইলে লড়াই বাঁধবেই।

মোয়াফেক কিন্তু এতে মোটেই ঘাবড়াল না। অপমান করে তাড়িয়ে দিলে সুলতানের দূতকে। যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল, আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে। সুলতান নিজে যুদ্ধে চললেন। সঙ্গে উজির আলি মোহম্মদ। রাজধানী ছেড়ে তাঁরা খানিকটা এগিয়ে গেছেন। এমন সময় কয়েকজন আফগান ওমরাহ এসে সুলতানকে কুর্ণীশ করে দাঁড়ালেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল তুরকান সেনা।

ওমরাহরা বললে, "জাঁহাপনা, অনর্থক খুন-খারাপি করে আর কাজ কি। দুষ্ট মোয়াফেক মারা গেছেন। শাহান শাহার মর্জ্জি হলে যাকে ইচ্ছা তাকেই তখ্‌তে বসাতে পারেন।"

খুসী মনে সুলতান বললেন, "তোমাদের শাহাজাদীত এখন তুরফানের বেগন। তাঁকে ত যেতে দিতে পারি না। এক কাজ কর। উজির আলী মোহম্মদকে নিয়ে যাও। আমি তাঁকেই তোমাদের আমীর বলে মেনে নিলাম।" বৃদ্ধ উজির চলে গেলেন আফগানের আমীর হয়ে এই ভাবে বৃদ্ধের ঋণ অন্ততঃ কিছুটা শোধ হওয়াতেও আমার মনে অনেকটা শান্তি এল। বেশ সুখেই কাটতে লাগলো দিনগুলো।

কিছুদিন থেকে আমি নিয়ম করেছিলাম। রোজ রাত্রে সুলতান ঘুমিয়ে পড়লে পর পাশের কামরায় গিয়ে কোরাণ পাঠ করতাম। পাঠ শেষ হলে তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। একদিন রাত্রে ঐরকম পাঠ শেষ করে ঘরে গিয়েছি। দেখি অবিকল আমার মত চেহারার এক যুবতী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। ঘুম ভেঙ্গে গেল সুলতানের। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে। আমি যা দেখেছি বললাম। অবাক হয়ে গেলেন সুলতান। "কি বলছ তুমি বেগম? কোরাণ পড়তে গেলে আবার কখন। এইতো শুয়েছিলে বিছানায়।"

কথাবার্ত্তা হচ্ছে আমাদের মধ্যে। এমন সময় সেই যুবতী এসে দাঁড়াল সুলতানের পাশে। দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ভুরু কুঁচকে যুবতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, "কে তুই দুষ্টা যাদুকরী। কোন্ সাহসে এসে ঢুকেছিস এখানে।" তারপর সুলতানের দিকে চেয়ে বললে, "শাহান শাহ, এইমাত্র আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম কিন্তু এসে দেখছি একি কাণ্ড! সুলতান ত হতভম্ব। একবার আমার দিক পানে একবার ওর দিক পানে তাকান।

কিছুই স্থির করতে পারেন না। দুজনেরই এক চেহারা। এক পোষাক, মায় গলার আওয়াজ, কথা বলার ধরণ পর্য্যন্ত অবিকল এক রকম।



সুলতানের অবস্থা দেখে আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "জঁাহাপনা, সারা জীবন তো দুঃখেই কাটল। ভেবেছিলাম এতদিনে বুঝি কপাল ফিরলো। কিন্তু কোথা থেকে আবার এ উৎপাত এসে জুটলো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"উৎপাত আমি না তুই? দুষ্টা ডাইনী, কোন সাহসে আমার রূপ ধরে এসেছিস? মনে করেছিস বুঝি জঁাহাপনাকে মায়া কান্নায় ভুলিয়ে এখানে বাসা বাঁধবি। সে গুড়ে বালী। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তবে দূর হ' এখান থেকে এক্ষুণি।" কোন কথা বের হলনা আমার মুখ দিয়ে; অঝোরে চোখের জলে ভাসতে লাগলাম। দেখে দুষ্টা বললে সুলতানকে, "জঁাহাপনা, ও আমার কথা শুনছে না। ওকে জল্লাদের হাতে দিয়ে দিন।"

একটু ইতঃস্তত করে সুলতান বললেন, "হতবুদ্ধি হয়ে গেছি বেগম কাণ্ড কারখানা দেখে। তোমাদের মধ্যে কে যে সত্যিকার লোক বুঝতে পারছি না। যা হোক তোমাদের দুজনকেই একবার ভাল রকম পরীক্ষা করে দেখব। তারপর যা হয় করা যাবে।" এই কথা বলে সুলতান ডেকে পাঠালেন আমার বুড়ো দাই খাদেজাকে। খাদেজা এসে আমাদের দুজনকে নিয়ে গেল পাশের কামরায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল কোন তফাৎ কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু এমনি বরাত আমার দুজনের ভেতর সে কোন তফাৎ দেখতে পেলো না। আমি দুঃখে মুষড়ে পড়লাম। কথা বলতে পারলাম না, আর সেই দুষ্টার মুখে কথার ফোয়ারা ছুটলো। তার কথায় ভুলে গেলেন সুলতান। আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। সমস্ত অলঙ্কার পাতি খুলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে আসতে হল সেখান থেকে। কয়দিন ত ভিক্ষা করে চলল। এভাবে আর যে কতদিন চলবে ভেবে পাচ্ছি না।" অঝোরে কাঁদতে লাগলো যুবতী তার কাহিনী বলে।

বাদশাহ শাহ আলতাফ যুবতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বেগম সাহেবা, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। এই দুনিয়ার নিয়ম। যা শুনলাম আপনার কাছে তাতে আর বেশী দিন কষ্ট পেতে হবে না আপনাকে। একটি গল্প বলছি শুনুন" বলেই বাদশাহ আরম্ভ করলেন,—

সমরখণ্ডের ঠিক উত্তর পূব দিকে বিখ্যাত শহর হারকেনিয়া। সেখানকার সুলতান ছিলেন মালেক খোদাবন্দ। ভারী খাম-খেয়ালী আর একগুঁয়ে। তাঁর উজির ছিলেন সালিম কার্ব্বাসা। অতবড় গুণী আর জ্ঞানী লোক বড় একটা দেখা যায় না। একদিন কার্ব্বাসা নাইতে গেলেন নদীতে। হঠাৎ তাঁর আংটিটি খুলে

পড়ে গেল আঙ্গুল থেকে। কিন্তু ডুবলো না। ভেসে রইল জলের উপর। উজির চাকরবাকরদের ডেকে বললেন, "ওরে শিগগির বাড়ি চল। দামী জিনিসপত্র সব এক্ষুণি সরিয়ে ফেলতে হবে বাড়ি থেকে।" বাড়ি ছুটে গেলেন উজির ভেজা কাপড়ে। চাকর বাকর ত অবাক। হঠাৎ এ আরার কি হল। উজির বললেন, "হা করে দেখছিস্ কি। যা বলছি কর। এক্ষুণি আমি গ্রেপ্তার হব দেখে নিস্।"

দামী জিনিসপত্র সব সরাতে লাগল চাকরবাকরেরা, পেছনের দরজা দিয়ে। অর্দ্ধেক জিনিস সরানো হয়েছে, এমন সময় কোতোয়াল এসে ধরে নিয়ে গেল উজিরকে। সুলতানের হুকুমে তাকে আটকে রাখল আঁধার গারদের ভেতর। খাবার বরাদ্দ হল দু'খানি আধপোড়া রুটি আর এক পেয়ালা জল। দুষমণরা উজিরের নামে যা তা লাগিয়ে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে সুলতানকে, তারই এই ফল।

বড় কষ্টে উজিরের দিন কাটে। দেখতে দেখতে কেটে গেল দুমাস। উজিরের ইচ্ছা হল খেজুর খেতে। কিন্তু কোতোয়াল রাজী হয় না। সুলতানের হুকুম নেই। কি করে দেবে সে। অশ্রু গড়িয়ে পড়ে উজিরের চোখ বেয়ে। কোথায় ছিলেন রাজ্যের উজির, বলতে গেলে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই সকলের—আর আজ! ভারী মুসড়ে পড়েন সালেম কার্ব্বাস।

ভারী দুঃখ হয় কোতোয়ালের, উজিরের অবস্থা দেখে। ভেবে চিন্তে একদিন রাত্তির বেলা সে চুপি চুপি এনে দিলে এক ডেলা পাকা খেজুর আর দুপেয়ালা জল। শিগগির খেয়ে ফেলুন সাহেব। কাকপক্ষীতেও টের পেলে আর আমার রক্ষা থাকবে না।"

খেজুরি পেয়ে উজির ত খুব খুসী। হাত মুখ ধুয়ে কেবল বসেছেন খেতে। হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই কোত্থেকে ছুটে এল দুটো ধাড়ি ইঁদুর। লাগিয়ে দিলে দুটোতে বিষম ঝগড়া, মারামারি হুঁটোপাটি। পড়বিতো পড় একেবারে সেই খেজুর তালের ওপর। চেপ্টে ছিট্‌কে পড়ল খেজুরের তাল চারদিকে।



দেখেতো উজির মহা খুসী! বলে উঠলেন, "যাক, এতদিনে তবে দুঃখের শেষ হল। আজই বোধ হয় এখান থেকে মুক্তি পাব।" সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল গারদের দরজা। কোতোয়াল এসেছে তাকে নিয়ে যেতে, সুলতান তলব করেছেন।

হাসিমুখে বাইরে এলেন উজির খোদার নাম নিয়ে। দরবারে যেতেই সুলতান নেবে এলেন তখ্‌ত ছেড়ে। উজিরের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কিছু মনে করো না কার্ব্বাস। শয়তানরা আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। বুঝতে পারিনি

তখন তাদের ষড়যন্ত্র। তুমি যেমন ছিলে তেমনি আবার উজিরী পদেই বহাল থাক। শয়তানরা আর তোমার কিছুই করতে পারবে না।"

গল্পটি শেষ করে বাদশাহ বললেন, "সেই উজির কার্বাসের মত আপনারও দুঃখ চরমে উঠেছে। এবার আপনি নিশ্চয়ই সুখের মুখ দেখতে পাবেন।" দুজনের কথা বার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় সামনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। কে আসে আবার এদিকে? সঙ্গে সঙ্গে বনের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক তেজী ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন এক সুন্দর যুবক। চোখে মুখে তাঁর ভয় চকিত ভাব। পোষাক পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন। গা বেয়ে ঘাম ঝরছে দর দর ধারে। অবস্থা দেখে মনে হল যেন কেউ তাঁর পেছনে তাড়া করেছে।

তিনি কাছে আসতেই যুবতী বললে, "জনাব, এই আমার স্বামী কিন্তু এঁর এ অবস্থা কেন।" চীৎকার করে উঠলেন যুবতী, "হুজুর! শাহান শাহ! কি হয়েছে আপনার। এভাবে চলেছেন কোথায়?" যুবকের কিন্তু এদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আর একজন ঘোড়সওয়ার তার পিছু পিছু। এঁরও চেহারা অবিকল আগের যুবকটির মত। কিন্তু পরণে সুলতানী পোষাক হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। মনে হল যেন ইনি তাকে তাড়া করে যাচ্ছেন।

দুজনের এক চেহারা দেখে বাদশাহ ত' অবাক। যুবতীকে বললেন, "বেগম সাহেবা, এযে দেখছি ভেল্কি বাজী। না আমিই ভুল দেখলাম। দুজনেরই অবিকল এক চেহারা। এ কি করে হয়।"

যুবতী বললেন, "তাহলে দেখুন জনাব। আমার কথা সত্যি কিনা!" এইভাবে কথাবার্ত্তা কইছেন দুজনে। এমন সময় পেছনের সেই যুবক ফিরে এলেন। হাতে তাঁর রক্তাক্ত তলোয়ার। গা বয়ে ঘাম ঝরছে। ঘোড়া থেকে নেমেই তিনি যুবতীর কাছে এসে বললেন, "পিয়ারে! স্বর্ণলতা ভ্রমে আমি নাগিনীকে আশ্রয় করে ছিলাম এতদিন। ভুল বুঝতে পারা অবধি কি কষ্টেই না কেটেছে আমার এ ক' দিন! তোমাকে যে আবার ফিরে পাব এ আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম খোদাকে ধন্যবাদ। এত সহজে আবার তোমার দেখা পেলাম। এখন আমার সমস্ত অপরাধ মাফ করে ঘরে চল পিয়ারী।" তারপর বাদশাহ শাহ আলতাফের পরিচয় পেয়ে মহা সমাদরে তাঁকেও নিয়ে গেলেন রাজধানীতে। কয়েক দিন সেখানে থেকে বাদশাহ আবার দেশে ফিরে এলেন।

শাহ আলতাফ দেশে ফিরলেন বটে। কিন্তু চিরস্থানীর কথা ভুলতে পারলেন না। সমস্ত কাজ কর্ম্মের ভেতরেও মাঝে মাঝে উঁকি মারতে লাগল চিরস্থানীর সুন্দর মুখখানি।

একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাদশাহ ঘুমিয়ে আছেন নিজের ঘরে, মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘর ময় আলো। তার মাঝে দাঁড়িয়ে চার পাঁচ ছয় জন পুরুষ। বিশাল তাদের চেহারা। আর তেমনি গায়ের রং। যেন কাঁচা সোনা। অবাক হয়ে গেলেন বাদশাহ। এরা কারা? এত রাত্রে এখানে এল কি করে?

বাদশাহ জেগে উঠেছেন দেখে লোকগুলি তাঁকে কুর্ণীশ করে বললে, "শাহান শাহ, আমরা চিরস্থান দ্বীপ থেকে এসেছি। আমাদের সুলতানার খবর নিয়ে।"

বাদশাহ উঠে তাদের বসতে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা

করলেন, চিরস্থানীর কথা। তারা বললে যে বাদশাহের জন্য চিরস্থানীর মন অস্থির হয়ে আছে। তাই তাঁরই হুকুমে তারা এসেছে বাদশাহকে সেখানে নিয়ে যেতে। বাদশাহ ত' চান তাই। তক্ষুণি চলে গেলেন তাদের সঙ্গে, চিরস্থান রাজ্যে। এতদিন পরে চিরস্থানীকে দেখে বাদশাহ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। চোখের জলে ভেসে গেলেন তিনি। ভারী খুসী হয়ে উঠলো



চিরস্থানী। বাদশাহের হাত ধরে ধরা গলায় বললে, "শাহান শাহ দুঃখ করবেন না। একটু পরীক্ষা করে দেখলাম সত্যিই আপনি আমাকে ভালবাসেন কি না। এখন সকলের সামনে বলছি। আজ থেকে শাহান শাহ আমার স্বামী হলেন। আমার ধন, প্রাণ, রাজ্য সমস্তর মালিক ইনি হলেন এখন থেকে।"

দরবার সুদ্ধ সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো চিরস্থানীর কথা শুনে। পরদিন শুভক্ষণে শাহ আফ্‌তাব চিরস্থান রাজ্যের তখ্‌তে বসলেন। এর পরেই বিবাহ। রাজ্যজুড়ে সুরু হল আনন্দ উৎসব। বিয়ের আগে চিরস্থানী বাদশাহকে বললে, "শাহান শাহ, বিয়ের আগে আপনাকে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এতে আমরা দুজনই সুখে থাকব।"

বাদশাহ রাজী হলেন চিরস্থানীর কথায়। চিরস্থানী তখন বললে, "জাঁহাপনা, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক হলেও আমরা হচ্ছি দৈত্যের জাত। মানুষের নিয়ম কানুনের চেয়ে আমাদের নিয়ম কানুন আলাদা। আপনাকে কথা দিতে হবে, আমি যখন যে কাজ করব তাতে কোন কথা বলতে পারবেন না। বললে ভারী দুঃখ পাবেন।"

বাদশাহ বললেন, "তাই হবে, তোমার কোন কাজে আমি বাধা দেব না।"

যথা সময়ে বাদশাহের সঙ্গে চিরস্থানীর বিয়ে হয়ে গেল। চিরস্থানীকে নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে দেশে ফিরবার কথা আর মনে রইল না। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। এখন জানা গেল চিরস্থানীর ছেলে হবে। খুসীতে ভরে উঠলো বাদশাহের মন। দশমাস দশ দিন পর চিরস্থানীর ছেলে হল। ছেলে তো নয় যেন ফুট্‌ফুটে গোলাপফুল। ছেলে দেখে বাদশাহের আনন্দ আর ধরে না। পরম স্নেহে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর আদর করে আবার ফিরিয়ে দিলেন মায়ের কোলে।

খাটের পাশে ছিল গনগনে আগুনের কুণ্ড। চিরস্থানী করল কি, ছেলেকে নিয়ে ফেলে দিলে সেই আগুনের মধ্যে। অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল বাদশাহের মুখ থেকে। সর্ব্বনাশী করল কি!

এমন সুন্দর ছেলে ! আর তাকে মেরে ফেললে।" আগুন জ্বলে উঠলো বাদশাহের মনে। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে চেপে গেলেন। দু'হাতে বুক চেপে বেরিয়ে গেলেন আতুড় ঘর থেকে।

কেটে গেল আর এক বছর। আবার চিরস্থানীর ছেলে হবে। বাদশাহও খুব খুসী। যথা সময়ে চিরস্থানীর একটি মেয়ে হল। রাজ্য জুড়ে সুরু হল আনন্দ উৎসব। ফুলের মত টুকটুকে মেয়ে পেয়ে বাদশাহ ছেলের শোক ভুলে গেলেন।



একদিন হল কি। বাদশাহ বেগম বসে কথা বার্ত্তা বলছেন। বেগমের কোলে মেয়েটি। আদর করছে চিরস্থানী মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে। হঠাৎ সেখানে এসে ঢুকলো এক সাদা কুকুর। বেগম চিরস্থানী করলো কি, কোলের মেয়েকে ফেলে দিলে সেই কুকুরটার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে সে মেয়েটাকে মুখে

তুলে নিয়ে চলে গেল। চিরস্থানীর মুখে মৃদু হাসি। যেন কি ভাল কাজই না করেছে!

রাগে দুঃখে বাদশাহের অন্তর জ্বলে উঠলো। কিন্তু উপায় কি। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে তো এদিকে মাথা খারাপ হবার যোগাড়। নাঃ, আর এখানে থাকা নয়। ভেবে চিন্তে একদিন বাদশাহ চিরস্থানীকে বললেন যে তিনি বহুকাল দেশ ছেড়ে এসেছেন। এখন একবার দেশে যেতে চান।

চিরস্থানী বললে, "জাঁহাপনা, আপনার এখন দেশে যাওয়াই দরকার। গত কাল খবর পেলাম, মোঘলরা আপনার রাজ্য হামলা করবার তোড়জোড় করছে। আপনি এ সময় গেলে খুব কাজ হবে। এর মধ্যে আমিও একবার যাব সেখানে।"

চিরস্থানীর হুকুমে দৈত্যরা বাদশাহকে রেখে এল তাঁর ঘরে। চারিদিকে খবর রটে গেল বাদশাহ ফিরে এসেছেন। প্রজারা আনন্দ ধ্বনি করে সম্বর্দ্ধনা করলে তাদের বাদশাহকে। উজিরের যেন ধড়ে প্রাণ এল।

বাদশাহের সামনে কুর্ণিশ করে বললেন, "জাঁহাপনা, হঠাৎ আপনি কোথায় চলে গেলেন। কত খোঁজ করলাম কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলনা; যা হোক আমার সাধ্যমত যতদূর সম্ভব রাজ্য চালিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ খবর পেলাম দুষ্ট মোঘলরা আবার হামলার তালে আছে আমাদের ওপর। আপনি এসে গেছেন ঠিক সময়ে। আর আমার চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে আছে এদিকেও। এখন দেখব দুষ্টরা আমাদের কি করতে পারে।"

শাহ আলতাফ সংক্ষেপে তাঁর কাহিনী বললেন, উজিরের কাছে। তারপর বেড়িয়ে পড়লেন যুদ্ধের আয়োজন কতদূর কি হয়েছে দেখবার জন্য। সহর কোতোয়াল ওয়েলির উপর ভার ছিল

সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ করবার। রাশি রাশি খাবার জমা করে রেখেছে সে। সব দেখে শুনে বাদশাহ তো খুব খুসী। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন মোঘলদের বাধা দিতে। রাজ্যের শেষ সীমায় তাঁর শিবির পড়লো।

এদিকে হয়েছে কি। চিরস্থানী একদল দৈত্য নিয়ে এসে সমস্ত রসদ দিলে নষ্ট করে। রেগে উঠলো ওয়েলী চিরস্থানীর কাণ্ড দেখে। চিরস্থানী বললে, "রাগ করছো কেন ওয়েলী। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলে বলো যে তাঁর বেগম এসে সব নষ্ট করে দিয়েছেন। তা'হলেই আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।"

ছুটে গেল ওয়েলী বাদশাহের কাছে। সব শুনে বাদশাহ গেলেন বেজায় ক্ষেপে। ছুটে এসে চিরস্থানীকে বললেন, "তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি বেগম। কিন্তু আর ত' চলেনা এরকম। দু দুটো সন্তান নষ্ট করেও তোমার আশা মেটেনি। আবার এখানে এসেছ দেশের সর্ব্বনাশ করতে। এর অর্থ কি বলত?"

মৃদু হেসে চিরস্থানী বললে, "বড় ভুল করলেন শাহান শাহ। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলেন না আপনি। জানেন দৈত্য কন্যা মিছামিছি কোন কাজ করে না। সেদিন যে দেখেছিলেন আমি ছেলেকে আগুনে ফেলে দিয়েছিলাম। আসলে ওটা আগুন নয়। তিনি হচ্ছেন দৈত্যদের কুল গুরু কাকলাশ। মহাজ্ঞানী আর নানা বিদ্যায় ওস্তাদ। ছেলেকে আমি তাঁরই হাতে দিয়েছি। আর সেই সাদা কুকুর হচ্ছেন একজন বিদ্যাধরী। নাচ, গান বাজনায় পাকা ওস্তাদ। মেয়েকে আমি তাঁর হাতেই দিয়েছি। একটু অপেক্ষা করুন। এক্ষুণি তাদের এখানে নিয়ে আসছি।"

চিরস্থানীর হুকুমে একজন দৈত্য গিয়ে ছেলে মেয়েকে নি এল সেখানে। ভারী খুসী হলেন বাদশাহ ছেলে মেয়ে দেখে

পেয়ে। চিরস্থানী বললে, "দেখলেন আমার কথা সত্যি কি না। এখন আরো শুনুন। আপনার কোতোয়াল ওয়েলী পাকা নেমক হারাম! দুষমণের কাছে ঘুষ খেয়ে সমস্ত খাবার রসদে জহর মিশিয়ে রেখেছে। তাই আমি সমস্ত খাবার রসদ নষ্ট করে দিয়ে আপনার লোকজনের প্রাণ বাঁচিয়েছি। যাক যা হবার হয়ে গেছে। এখনই আপনি দুষমণদের উপর হামলা করুন। জয় আপনার হবেই।"

ওয়েলীর গর্দ্দানের হুকুম দিয়ে বাদশাহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন মোঘলদের ওপর। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল তারা। খুসী মনে শিবিরে ফিরে এলেন বাদশাহ। চিরস্থানী তখন বললে, "শাহান শাহ, ছেলে মেয়ে নিয়ে এখন চললাম। আপনাকে তো আগেই বলেছি যে কথার খেলাপ করলে কপালে দুঃখ আছে।" চলে গেল চিরস্থানী ছেলে মেয়ে নিয়ে।

বাদশাহ ভারী মুষড়ে পড়লেন। রাজধানীতে ফিরে এসে একেবারে শয্যা নিলেন। খান না দান না। কাজ কর্ম্ম একদম বন্ধ। আমীর ওমরাহরা কত বোঝালেন। উজির ধর্ণা দিয়ে পড়লেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বাদশাহ দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। বাঁচেন কি না বাঁচেন। হায় হায় করতে লাগল রাজ্যের লোক।

এমন সময় হঠাৎ একদিন চিরস্থানী এসে হাজির বাদশাহের পাশে। সঙ্গে তার ছেলে মেয়ে দুটি। দেখে বাদশাহের ধরে প্রাণ ফিরে এল। চোখের জলে ভাসতে লাগলেন তিনি বাচ্চা দুটিকে বুকে টেনে নিয়ে। চিরস্থানী বললে, "দুঃখ করবেন না জাঁহাপনা। কথা রাখতে পারেন নি বলেই এত কষ্ট পেতে হল। আর আমরা আপনাকে ছেড়ে যাব না।"

খুসী হলেন বাদশাহ বেগমের কথা শুনে। দেখতে দেখতে ভাল হয়ে উঠলো তাঁর শরীর। ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন বাদশাহ শাহ আলতাফ্।

গল্পটি শুনে সখীরা বাদশাহের খুব প্রশংসা করতে লাগল। শাহাজাদী কিন্তু এতে মোটেই সায় দিলেন না। বললেন, "কেন যে তোরা বাদশাহের এত প্রশংসা করছিস বুঝি না। চিরস্থানীর কাছে তিনি কথার খেলাপ করেছেন। এতেই বোঝা যায় সত্যি সত্যি তিনি তাকে ভালবাসতেন না। আমি জানি পুরুষদের সব্বাই ঐ রকম ভণ্ড আর জুয়াচোর।"

ফতিমা বললে, "আচ্ছা শাহাজাদী, আমি এখন কৌলফ ও দেলেরার কাহিনী বলব। এ কাহিনী শুনলে তোমার মত ফেরাতেই হবে।" ফরকনাজ বললেন, "বেশ বল না শুনি, কি তোমার গল্প।" ফতিমা আরম্ভ করল,—



কৌলফ ও দেলেরা

হাজি আবদুল্লা ছিলেন দামাস্কাস নগরের সেরা ধনী ও সওদাগর। দামী দামী হীরা জহরতে বোঝাই ছিল তাঁর ভাণ্ডার। আর সিক্কা মোহরের তো কথাই নেই। দাস দাসী লোক জনে মহল জম জমাট।

এত সব থাকতেও সওদাগরের মনে সুখ নেই। বুড়ো হয়ে গেলেন, কিন্তু ছেলেপুলে হল না একটিও। পীর ফকিরের দরগায় সিন্নি মানত, গরীব দুঃখীদের দান খয়রাত, কত কিছুই করলেন সওদাগর। সবই বিফল হল। বড় দুঃখে দিন যায় বুড়ো সওদাগরের।



একদিন বেড়াতে বেরিয়ে সওদাগার দেখতে পেলেন, জোড়া

খেজুর গাছের নীচে বসে আছেন এক উদাসী দরবেশ। সওদাগর গিয়ে সেলাম করে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। মুখ তুলে চাইলেন দরবেশ সওদাগরের পানে, "মুখখানি বড় ভার ভার দেখছি যে বাপজান! হয়েছে কি বলতো?"

জোড় হাতে সওদাগর বললেন তাঁর দুঃখের কথা।

খানিকক্ষণ ভাবলেন দরবেশ, চোখ বুজে। তাঁরপর বললেন, "হুঁ—খোদার ইচ্ছা বদলাবে কে। তুমি এক কাজ কর। সহরের একেবারে পূবদিকে থাকে দর্জ্জি গোলাম নবী। তার একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি বড় ভাল আর স্বাস্থ্যবতী। ওকে বিয়ে করে নিয়ে যাও। চাঁদের মত ছেলে হবে।"

তাই করলেন সওদাগর। যথা সময়ে তার একটি ছেলে হল। বুড়ো বয়সে ছেলের মুখ দেখে সওদাগরের আনন্দ আর ধরে না। দুহাতে বিলিয়ে দিলেন ধন দৌলত, গরীব দুঃখীদের ভেতর। ছেলের নাম রাখা হল কৌলফ। বাড়তে থাকে কৌলফ বাপ মায়ের আদরে। রূপের জৌলুসে ভরে ওঠে চারিদিক। লেখা পড়া, হাতিয়ার চালানো, সব কিছুতেই হয়ে ওঠে পাকা ওস্তাদ। জয় জয়কার পড়ে যায় চারদিকে কৌলফের। খুসীতে ভরে উঠে সওদাগরের মন। চোখ বেয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দাশ্রু।

এই ভাবে দিন যায়। বুড়ো সওদাগরের বয়স বাড়ে। অচল হয়ে পড়ে শরীর। ছেলে কৌলফকে সৎভাবে থাকতে উপদেশ দিয়ে একদিন সওদাগর চলে যান ওপারের ডাকে। কৌলফ এখন স্বাধীন তরুণ যুবক। এন্তার ধন দৌলত তার হাতে। ধূম পড়ে গেল ফুর্ত্তির। জুটলো এসে সহরের যত সব ওঁচা ছোঁড়া। খাও দাও আর মজা কর! দেখতে দেখতে সব সাবাড়, আর ইয়ার বন্ধুর দলও দে চম্পট। এতদিনে চোখ

ফুটলো কৌলফের। জিনিষ পত্তর, দোকান পাট সব গেছে একে একে। বাকী মাত্র বাড়িখানা। কিন্তু ইট-কাঠ খেয়েতো আর প্রাণ বাঁচেনা! ভেবে চিন্তে সে বাড়িখানা বিক্রয় করে চলে গেল দেশ ছেড়ে।

পারস্যের রাজধানী তেহরাণ শহর। ঘুরতে ঘুরতে কৌলফ গিয়ে উঠলো সেখানকার এক সরাইখানায়। বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে আগাম দু' মাসের ভাড়া আর খাবার খরচ দিয়ে দিলে সে। সরাইয়ের মালিক তো খুব খুসী।

কৌলফ খায় দায় বেড়ায় আর সহর দেখে। এইভাবে দিন যায়। এই সময় হঠাৎ পারস্যের অধীন বোখরা, খিবা আর তাসখন্দের সুলতানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। শাহ আব্বাস তখন পারস্যের বাদশাহ। বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিনি চললেন বিদ্রোহ দমন করতে। সুযোগ বুঝে কৌলফ চাকরী নিলে বাদশাহী ফৌজে। তুমুল লড়াই সুরু হল দু' পক্ষে। তিনদিন তিন রাত্রি লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়ে পালাতে লাগল। এই যুদ্ধে অসাধারণ রণ-কৌশল আর বীরত্ব দেখালো কৌলফ। তার বিক্রমেই বিদ্রোহীরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। ভারী খুসী হলেন বাদশাহ, কৌলফের উপর। খোলা দরবারে সম্মানিত করে বাদশাহী ফৌজের সম্পূর্ণ ভার দিলেন তার উপর। এই সময় বাদশা হঠাৎ মারা গেলেন। শাহজাদা মির্জ্জান বসলেন পারস্যের তখ্‌তে। মির্জ্জানের সাথেও কৌলফের খুব ভাব, কাজেই বেশ সুখেই তার দিন কাটতে লাগলো।

একদিন কৌলফ বেড়াতে বেরিয়েছেন। সদর রাস্তা ধরে চলতে চলতে সামনে পড়ল প্রধান উজির বৈরামখাঁর বাড়ি। আনমনে দেখতে দেখতে চলেছেন। হঠাৎ দেখলেন সাতজ্বালার উপর থেকে এক অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে তাকিয়ে দেখছে

তাঁর পানে, এক দৃষ্টে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন কৌলফ। মানুষের যে এত রূপ থাকতে পারে এ তাঁর জানা ছিল না। নিশ্চয়ই উজিরের কোন আত্মীয় হবে। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল কৌলফের ভেতর থেকে। চলে গেলেন সেখান থেকে তারাতারি। কে কখন দেখে রটিয়ে দেবে নানা কথা! বাড়ি ফিরেও কিন্তু তাঁর মন শান্ত হল না। সর্ব্বদা সেই মেয়েটির চেহারা মনে পড়তে লাগল। পরদিন আবার কৌলফ গেলেন সে দিক পানে। উজিরের বাড়ির কাছে যেতেই দেখেন মেয়েটি জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অপেক্ষায়। আজ আলাপ হয়ে গেল দুজনে চোখে চোখে। ফিরে গেলেন কৌলফ আজও নিজের বাড়ির দিকে।

পরদিন বিকাল বেলা তিনি আবার বেড়াতে বেরিয়েছেন। রাস্তায় এক বুড়ী এসে সেলাম করে দাঁড়াল তাঁর সামনে। "কি চাও বুড়ী ?" শুধোলেন কৌলফ, মুখে বিরক্তির ছাপ। মৃদু হেসে বুড়ী বললে, "এত নারাজ হচ্ছ কেন বাপজান। তুমি যার জন্যে বেড়িয়েছ, তার কাছ থেকেই আমি আসছি।" শুনে খুসী হ'ল কৌলফ। হাসি মুখে বললেন, "তাই নাকি বুড়ী মা! কে সে, আর কি খবর বলত ?"

বুড়ী বললে, "এখানে নয়। নিরিবিলি হওয়া চাই। কথা আছে অনেক।" কৌলফ বাড়ি ফিরে গেলেন বুড়ীকে সাথে নিয়ে। নিরিবিলি বায়গায় বসে বুড়ী বললে, "বাপজান, সেই যে মেয়েটি দেখেছ না, ও হচ্ছে উজির বৈরাম খাঁর পহেলা বিবির মেয়ে। মেয়েটির মা নেই। আমিই তাকে মানুষ করেছি, কোলে পিঠে করে। উজির আবার বিয়ে করেছেন। নূতন বিবির কথায় তিনি ওঠেন বসেন। বিবির ইচ্ছা, মেয়েটাকে যেমন তেমন করে বিদায় দেন—তিনি বাঁচেন। বলতে কি

বাপজান, মেয়েটা একরকম গারদেই আছে। তার ইচ্ছা তুমি তাকে বিয়ে কর, ও বেঁচে যায়।"



আনন্দে অধীর হয়ে কৌলফ বললে, "এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে বুড়ী মা। তুমি যা আনন্দ দিলে তা বলবার নয়। দেলেরাকে পেলে আমার জীবন সার্থক হবে। একথা তুমি তাকে জানিয়ে দিও।"

বুড়ী চলে গেল। মনের আনন্দে কৌলফ অনেকক্ষণ ধরে বেড়িয়ে ঘরে ফিরলেন।

এদিকে হয়েছে কি, বৈরাম খাঁ আবার দুচোখে দেখতে পারতেন না কৌলফকে। কোথাকার কে একটা পথের লোক, সে কিনা এসেই হয়ে গেল একেবারে সিপাহ সালার।

তারপর নয়া বাদশাহের সাথে তার যে রকম ভাব! কোনদিন তাঁর উজিরী নিয়েই না টানাটানি পড়ে যায়! কৌলফের সাথে দেলেরার বিয়ে দিলে বেশ হয়। বুড়ীর কাছ

থেকে এই কথা শুনে উজির একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "বুড়ো মানুষ বলে বেঁচে গেলি আজ তুই। সাবধান, ও কথা যেন আর না শুনি তোর মুখে। মেয়ে আমার। আমিই করব যা করবার। তুই কেন ফোকর দালালী করতে এলি। দূর হ আমার সুমুখ থেকে।"

মুখ কাঁচু মাচু করে ফিরে গেল বুড়ী। এদিকে হল কি। উজির গিয়ে লাগাল বাদশাহের কাছে কোলফের নামে নানা বদনাম। 'যে রকম তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, কোনদিন না সে বাদশাহী তখ্‌ত দখল করে বসে! এমন লোককে আগে থেকেই সরিয়ে ফেলা ভাল।'

কথায় বলে 'বড় লোকের খেয়াল আর ভাঙ্গা দেয়াল'—এদের বিশ্বাস করতে নাই। অনবরত কানভাঙ্গানি পেয়ে বাদশাহ ভারী চটে গেলেন কৌলফের উপর। বাদশাহের হুকুমে কৌলফের চাকরী গেল; যা কিছু জমা ছিল তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি রাজধানী ছেড়ে। ঘুরতে ঘুরতে সমরবন্দি সহরের এক মসজিদে গিয়ে উঠলেন। মসজিদের ইমাম ভারী ভাল লোক। সমস্ত অর্থ তাঁর হাতে দিয়ে কৌলফ রয়ে গেলেন সেখানে।

এই ভাবে দিন যায়। বহুলোক আসে ঐ মসজিদে নামাজ পড়তে। তাদের অনেকের সাথেই আলাপ পরিচয় হয়ে গেল কৌলফের। মজাফর আমেদ ছিল তাদের একজন। মজাফরের অবস্থা বেশ ভাল। কৌলফকে একদিন সে নিয়ে গেল তার বাড়ি। তারপর খাইয়ে দাইয়ে কয়েকটি মোহর দিয়ে বিদায় করলে। কৌলফ খুব খুসী হল মজাফরের উপর। হাঁ, লোকের মত লোক বটে! বড় একটা দেখা যায়না ও রকম। এর পর থেকে প্রায়ই তাঁর নিমন্ত্রণ হতে লাগল মজাফরের ওখানে।

একদিন কৌলফ গেছেন নেমন্তন্ন খেতে। মজাফর তাঁকে নিরিবিলি ডেকে বললে, "বাপজান, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি তুমি যদি রক্ষা কর তো এযাত্রা বেঁচে যাই।

কৌলফ বললেন, কি করতে হবে বলুন। আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

মজাফর বললে, "আমার ছেলে তাহেরকে জানতো? মাত্র কয়েক মাস আগে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী আর গুণবতী; কিন্তু তাহের তার একেবারে উল্টো। বিয়ের পর থেকে অনবরত ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে—দুজনার মধ্যে। আজ দিন পনের হল হতচ্ছাড়াটা আবার বৌকে দিয়েছে তালাক। তারপর রাগ পড়তেই এখন সুরু হয়েছে ছট্‌ফটানি। বলে, 'ওকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। যেরকম করেই হোক আবার বৌকে ঘরে আন'।

শোন কথা! আন বললেই আনা যায় নাকি! তালাক দেবার কালে মনে ছিল না? তা সে কি শোনে ওসব। গেলাম মৌলভী সাহেবের কাছে। তিনি কোরান আওড়ে বললেন, 'উপায় আছে। যদি ঐ বৌকে কেউ আবার বিয়ে করে একদিন পর তালাক দেয়, তবেই তোমার ছেলের সাথে তার আবার বিয়ে হতে পারবে। নইলে নয়'। বাপজান, এজন্যই তোমার স্মরণ নিলাম। তুমি যদি বৌকে বিয়ে করে পরদিন তালাক দিয়ে চলে যাও তবেই রক্ষা হয়। তোমাকে এজন্য আমি ইনাম দেব একশো সোনার মোহর। কেমন, রাজী তো?"

রাজী হয়ে গেলেন কৌলফ। সেই রাত্রেই তাঁর বিয়ে হয়ে গেল তাহেরের বৌয়ের সাথে। বাসর ঘরে গিয়ে কৌলফ ত হতভম্ব! "আরে এযে দেখছি সেই দেলেরা!" দেলেরাও তাই। দুজনে স্থির করলেন—এতদিন পর যখন খোদা তাদের

মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন আর ছাড়াছাড়ির কোন কথাই উঠতে পারে না। এতে যা হয় হোক।

পরদিন ভোরে তাহের একশো সোনার মোহর নিয়ে হাজির। বললে, "এখন তালাক দিয়ে চলে যাও ভাই। আর এই নাও তোমার ইনাম।"

মোহর নিলেন না কৌলফ। বললেন, "মোহরগুলো তুমিই রেখে দাও তাহের। আমি তালাক দেবার জন্য বিয়ে করিনি।"

বলে কি সর্ব্বনেশে লোকটা! চমকে উঠলো তাহের. ছুটে গিয়ে বললো বাপের কাছে সব কথা। মজাফর বললে, "হুঁঃ, বুঝেছি। বড় রকম দাও মারবার তালে আছে ছোঁড়া। বেশ, নিয়ে যাও আর একশো। দিয়ে বিদেয় কর, তালাকনামা লিখিয়ে নিয়ে।" ফিরে এল আবার তাহের আরো একশো মোহর নিয়ে কিন্তু কৌলফের সেই এক কথা। লাখ মোহর হলেও সে বউ ছেড়ে দেবে না।

ক্ষেপে উঠলো বাপ-বেটা কৌলফের উপর। কাজীর কাছে নালিশ জানালে কৌলফের নামে। কাজীর হুকুমে কৌলফ কয়েদ হলেন অন্ধকার গারদে। মারধর চললো জোর তার উপর। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কৌলফ অটল রইলেন তার সংকল্পে। দিন সাত-আট পর কৌলফকে আবার নিয়ে যাওয়া হল কাজীর কাছে। কাজী বললে, "কিহে ছোকরা, এখনো কি তোমার মত বদলায় নি?"

কৌলফ বললেন, মত আর কি করে বদলাবে হুজুর। নিজের বিয়ে করা বৌ আহাম্মক ছাড়া কে মিছামিছি তালাক দেয় বলুন।"

কাজী বললে, "বামন হয়ে চাঁদে হাত! ছোঁড়া যা পাচ্ছ নিয়ে চলে যাও। ঐ পরীর মত মেয়ে নিয়ে রাখবে কি করে?

এবার একটু চালাকী করলেন কৌলফ। বললেন, "হুজুর, ভেবেছিলাম পরিচয়টা আর দেব না ; কিন্তু না দিয়ে দেখছি আর চলছে না। আমি হচ্ছি কোজণ্ডি সহরের সেরা ধনী সওদাগর মাসুদ সাহেবের একমাত্র পুত্র নুরউদ্দিন। বেসাতি নিয়ে বেরিয়েছিলাম বাণিজ্য করতে। ডাকাতের হাতে পড়ে আজ আমি হয়ে পড়েছি পথের ফকির। বাবা এ সমস্ত খবর কিছুই জানেন না। হুজুর যদি হুকুম দেন তবে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জানাই আমার অবস্থা।"



কৌলফের কথা শুনে কাজী কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর ভয়ে ভয়ে বললো, "সত্যি বলছো তুমি মাসুদ সাহেবের ছেলে ?"

কৌলফ বললেন, "হাঁ সাহেব, সত্যিই আমি মাসুদ সাহেবের ছেলে। ডাকাতের হাতে পড়েই আজ আমার এই দশা হয়েছে।"

কাজী বললো, "তাইতো বাপু, তুমি যে বড় মুস্কিলে ফেললে দেখছি। তা আগে একথা বলোনি কেন। তাহলে তো এত কষ্ট পেতে হতো না।"

কৌলফ বললেন, "কি করব হুজুর সবই আমার নসীব। না হলে এমন হবে কেন।"

কাজী তখন মজাফরকে বললো, "দেখুন সাহেব, এ যখন এত বড় ঘরের ছেলে তখন আর তাকে স্ত্রী ত্যাগ করতে বলা যায় না কিছুতেই।"

বাপ বেটা একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো কাজীর কথা শুনে। 'এ আপনার কিরকম বিচার কাজী সাহেব? এ ছোঁড়া কিছুতেই মাসুদ সাহেবের ছেলে নয়। শয়তানটা মিথ্যা কথা বলছে, আমরা হলফ করে বলতে পারি।'

কাজী বললো "বেশ কথা। আমি খবরাখবর নিয়ে দেখি। যদি এর কথা মিথ্যা হয় তবে তোমাদের বৌ তোমরা নিয়ে যাবে আর এর হবে প্রাণদণ্ড।"

কাজীর কথা শুনে তাহের বললে, "তবে সত্যাসত্য না জানা পর্য্যন্ত ওরা দুজন আলাদা থাকুক।"

কাজী বললো, "তা কি করে হয়? এরকম সরিয়ত বিরোধী কাজ আমি করতে পারিনা।"

কিছুতেই কিছু হোল না দেখে মজাফর বললে, "হাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে। মাসুদ সাহেবকে আমিও খুব ভালভাবে জানি। কাজীসাহেব যদি হুকুম করেন তো আমিই লোক পাঠিয়ে সব খবর নিয়ে আসতে পারি।"

কাজী বললো, "তবেতো খুব ভালই হয়। যত শীঘ্র পার তুমিই তবে খবরা-খবর নিয়ে আমাকে জানাবে। তারপর যা হয় করব।"

কথা বার্ত্তার পর দুই পক্ষই বাড়ি চলে গেল।

কৌলফের কাছে দেলেরা সব কথা শুনে বললে, "কেমন দেখ, বলেছিলাম না, মাসুদ সাহেবের কথা বললেই কাজ হবে। এখন আর এখানে থাকা নয়। আজ রাত্রেই পালাতে হবে—একেবারে বোখারা সহরে। তারপর আর আমাদের পায় কে।"

তাই স্থির হল বটে। কিন্তু কাজের বেলা হলো তার উল্টো। রাত্রে পালাতে গিয়ে তারা দেখলেন বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারা বসে আছে—বেড়োবার উপায় নাই। তখন দুজনে পরামর্শ করলেন যে কাল কাজীর কাছে বলে এখান থেকে সরে যেতে হবে অন্য বাড়িতে। শত্রুর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা মোটেই চলতে পারেনা।

পরদিন কৌলফ গেলেন কাজীর কাছে, তাঁর অনুমতি চাইতে। দেখা দেখি মজাফর আর তাহেরও গিয়ে হাজির সেখানে। দুপক্ষকে দেখে কাজী বললো, "আবার কি হল তোমাদের?"

কৌলফ বললেন, "হুজুর, শত্রুর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে আমাদের ভারী ভয় হচ্ছে। তাই এসেছি যদি আমাদের অন্য বাড়িতে থাকবার অনুমতি দেন তবে বড়ই ভাল হয়।"

এই কথা শুনে তাহের বললে, "হুজুর, ও আলাদা থাকতে চায় থাকুক। কিন্তু দেলেরাকে নিয়ে যেতে পারবেনা। আমি জানি ওর সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে সে বেচারা দিন রাত চোখের জলে ভাসছে। কাজেই ওর সঙ্গে দেলেরাকে যেতে দেওয়া মোটেই উচিত নয়।"

কৌলফ বললেন, "কে বলেছে দেলেরা চোখের জলে ভাসছে? সে আমাকে ছেড়ে বেহেস্তে গিয়ে থাকতেও রাজী নয়। বিশ্বাস না হয় তাকে এনে জিজ্ঞাসা করুন। যদি আমার কথা মিথ্যা হয় এক্ষুণি তাকে ছেড়ে চলে যাব।"

তাহের বললে বেশ, "তাকে নিয়ে এসেই জিজ্ঞাসা করা হোক। যদি কৌলফের কথাই সত্যি হয়, তা'হলে আমিও দেলেরাকে ওর সঙ্গে যেতে আপত্তি করবো না।"

কাজী তখন দেলেরাকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কাকে ভালবাসে। দেলেরা বললে, "হুজুর, আমি আমার স্বামী কৌলফকেই ভালবাসি। মেহেরবানি করে হুকুম দিন যেন তাঁরই সাথে অন্য যায়গায় গিয়ে বাস করতে পারি।"

দেলেরার কথায় তাহের একেবারে আগুন হয়ে উঠলো, "নেমকহারাম, শয়তানী, তোকে বিশ্বাস করে এই ফল হলো! নরকেও তোর স্থান হবে না।"

তাহেরের অবস্থা দেখে কাজী বললে, "আর অনর্থক হৈ-চৈ করে লাভ কি তাহের। এখনত চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটে গেল। আর তাদের একত্র যেতে বাধা দেওয়া যায় না। তাই আমি স্থির করেছি যে খবরাখবর না পাওয়া পর্য্যন্ত এরা অন্য যায়গায় গিয়ে থাকুক। আমি লোক রেখে দেব। তারা কড়া নজর রাখবে যাতে এরা পালাতে না পারে।"

কি আর করা! মুখ বাঁচু মাঁচু করে বাপ বেটা বাড়ি চলে গেল। আর কৌলফ দেলেরাকে নিয়ে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। দেলেরার নিজস্ব কিছু অর্থ ছিল। তাই দিয়ে সেখানকার খরচ পত্র চলতে লাগলো।

এই আশ্চর্য্য প্রেমের কথা দেখতে দেখতে চারদিক ছড়িয়ে পড়লো। অনেকে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে লাগলো। এইভাবে দিন যায়। একদিন এক সুন্দর সৌম্য-মূর্ত্তি ভদ্রলোক এলেন তাদের কাছে। তাঁর পরণে উঁচু দরবারি পোষাক। চালচলনও খুব বড় লোকের মত। তিনি এসে তাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসী হলেন এবং কৌলফকে বললেন, "যুবক,

তোমাদের অপূর্ব্ব প্রেমের কথা শুনে আমি তোমাদের দেখতে এসেছি। খোদার কাছে প্রার্থনা তোমরা চিরসুখী হও।"

ভদ্রলোকটির কথায় খুসী হয়ে কৌলফ তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ হলে দেলেরা তাঁকে আরও খুসী করবার জন্য রাবাব বাজিয়ে কয়েক খানা প্রেমের গান শোনালো। দেলেরার রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক! কৌলফকে বললেন, "যুবক, এ-রত্ন একমাত্র তোমারই উপযুক্ত। ঐ হোঁৎকা তাহের ওকে কিছুতেই পেতে পারে না।"

ভদ্রলোকের কথায় কৌলফের চোখ দিয়ে জলধারা বয়ে পড়তে লাগল। মাথা নত করে তিনি কাঁদতে লাগলেন নিঃসাড়ে। দেখে তিনি বললেন, "যুবক, হঠাৎ তুমি এত কাঁদছো কেন। আমি কি কোন কথা বলে তোমার মনে আঘাত দিয়েছি?"

কৌলফ বললেন, "না সাহেব, আপনি কিছুই করেন নি। করেছে আমার পোড়া নসীব যে জন্য এত কাঁদছি। হয়তো এসুখ আমার নসীবে আর বেশী দিন সহ্য হবেনা।"

ভদ্রলোক বললেন, "এরকম কথা বলছো কেন যুবক? সহ্য হবেনা কেন? দেলেরার মত রত্ন যার, সে কখনো অসুখী হতে পারে! তবে তোমার দুঃখ কিসে—আমাকে খুলে বল। জেনে রেখ আমার মত হিতৈষী তোমাদের আর দুজন নেই।"

চোখের জল মুছে কৌলফ একে একে প্রকাশ করলেন তার সমস্ত কথা। তারপর বললেন, "জনাব, আমি তো আর সত্যি সত্যি মাসুদ সাহেবের ছেলে নই। কাজেই সত্য খবর বেরিয়ে পড়লে যে কি দশা হবে তাই ভেবে কাঁদছি।"

কৌলফের কথা শুনে ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তাইত যুবক, বড়ই মুস্কিলের কথা। কাজী লোকটি বড় কঠিন লোক। একথা

জানলে আর তোমার রক্ষা থাকবে না। যাক, খোদার কাছে প্রার্থনা কর যাতে রক্ষা পেয়ে যাও। এছাড়া তো আর উপায় দেখছিনা।" এই কথা বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ভদ্রলোক তো চলে গেলেন। আর এদিকে দুজনের মন দিন রাত অশান্তিতে কাটতে লাগলো। কাজী সময় দিয়েছিলেন যে সমস্ত খবর নিয়ে পনর দিনের দিন তিনি কৌলফকে তলব করবেন। দেখতে দেখতে চৌদ্দ দিন কেটে গেল। পরদিন সকালেই সব প্রকাশ হয়ে পড়বে—তখন আর রক্ষার কোন উপায় থাকবে না। কৌলফ দেখলেন জল্লাদের তলোয়ার যেন তার মাথার উপর উঁচিয়ে আছে। অভিভূত হয়ে তিনি দেলেরাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন দুজনে। সারা রাত ধরে ঘুম হলনা একটুও। কেবল কান্না আর কান্না। ভোর হতে না, হতেই বললেন, "প্রাণের দেলেরা, এবার বিদায় দাও। আর আমাদের দেখা হবেনা।" বলতে বলতে কৌলফ দেলেরাকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—বালকের মত। দেলেরাও কাঁদতে কাঁদতে বললে, "প্রিয়তম, আমিও তোমার পিছু পিছু আসছি। যদি তোমার গর্দ্দান যায় আমিও সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।"

এইভাবে কান্নাকাটি চলছে। হঠাৎ ঘরের দরজায় ঘা পড়লো; "কৌলফ, দরজা খোল শীগগির।" চমকে উঠলেন দুজনে। তারপর দেলেরাকে শেষ আদর জানিয়ে কৌলফ উঠলেন বিছানা ছেড়ে। টলতে টলতে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন। অমনি কাজী মুজাফর, তাহের আর কাজীর কর্ম্মচারীরা এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

কাজীর দিকে তাকিয়ে কৌলফ ধরা গলায় বললেন, "চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে।" মৃদু হেসে কাজী বললে,

"মন শান্ত কর যুবক। গত রাত্রে তোমার পিতার কাছ থেকে আমাদের লোক ফিরে এসেছে। তার মুখে সমস্ত শুনে আমি নিজেই এসেছি তোমাকে খবর দিতে। তুমি মিথ্যা কথা বলনি, এ জানতে পেরে আমি যে কি খুসী হয়েছি তা মুখে বলতে পারিনা। যাক না জেনে তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছি, এজন্য কিছু মনে করোনা। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখন তুমি যেখানে খুশী যেতে পার। কেউ আর আটকাতে পারবে না।"

কাজীর কথা শেষ হতেই তাহের বললে, "কৌলফ আমারও আর এতে কোন আপত্তি রইলো না। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।"



সব দেখে শুনে দেলেরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। আর কৌলফ একেবারে হতভম্ব। এ হলো কি করে! স্তব্ধ হয়ে ভাবছেন তিনি। এই সময় একজন পরিচারক এসে তাকে একখানি চিঠি দিয়ে সেলাম করলে। তারপর বললে, 'হুজুর,

আপনাকে হারিয়ে সাহেব আর বিবিসাহেবা একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন। এখন খবর পেয়ে যেন ধরে তাঁদের প্রাণ ফিরে এসেছে। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য। যত শিগগির হয় চলুন। আর দেরী করবেন না।'

কৌলফ বুঝলেন এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। মনের ভাব মনেই চেপে তিনি চিঠিখানি নিয়ে পড়তে লাগলেন। চিঠিতে লেখা আছে।

"বাপজান, তোমাকে হারিয়ে অবধি আমাদের প্রাণের শান্তি হারিয়ে ফেলেছি। বিশেষতঃ, তোমার মা তো একেবারে শয্যা নিয়ে আছেন। চিঠি পাওয়া মাত্রই আমার আম্মাজানকে নিয়ে যত শীঘ্র পার চলে এসো। তোমার আসার খরচ বাবদ কিছু অর্থ পাঠালাম, তাই দিয়ে সব বন্দোবস্ত করে আসবে। আশা করি ভালই আছ।

ইতি—তোমার আব্বা

মোহাম্মদ মাসুদ।"

চিঠি পড়া শেষ হতেই গোটাদশেক উট এসে দাঁড়ালো সরাইখানার উঠোনে। উটগুলির পিঠে বোঝাই নানারকম মালপত্র আর ধনরত্ন। চাকরেরা এসে কৌলফকে সেলাম করে বললে, "মালপত্র সব কোথায় রাখব হুজুর বলুন।" চতুর কৌলফ বললেন, "ওসব আমার এই ঘরে এনে রাখ। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম কর।" চাকরেরা তাই করতে লেগে গেল। আর কাজী তার লোকজনসহ কৌলফের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কাজী চলে গেলে পর কৌলফ চিঠিখানি দেলেরার হাতে দিয়ে বললেন, "কি করে যে কি হল একথা তো আমি কিছুতেই

বুঝতে পারলাম না দেলেরা। নিশ্চয়ই এর ভেতর কোন রহস্য আছে, কি বল?' দেলেরা বললে, 'এ নিশ্চয়ই খোদার দোয়া। না হলে এ হলো কি করে।' এইভাবে দুজনে কথাবার্ত্তা হচ্ছে' এমন সময় সেই ভদ্রলোক আবার এলেন তাদের কাছে, 'এই যে কৌলফ, আবার এলাম তোমাদের দেখতে। এখন কেমন হলো বল তো। তুমি তো বলেছিলে মাসুদ সাহেবের ছেলে নও তুমি।'

বিনীতভাবে কৌলফ বললেন, 'সত্যি বলছি জনাব; আমি মাসুদ সাহেবের ছেলে নই। প্রাণের দায়েই আমাকে এই ভাবে প্রতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু কি করে যে কি হল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

ভদ্রলোক বললেন, "সে যাই হোক, যদি তাই হয় তবে আজ রাত্রেই তোমরা এখান থেকে পালিয়ে যাও। নইলে বিপদে পড়তে পার। আমি এখন যাই। তোমরা সুখী হও।" এই কথা বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ক্রমে বেলা পড়ে এল। কৌলফ ও দেলেরা পলায়নের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন রাত গভীর হওয়ার অপেক্ষায়। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ সরাইখানার সামনে বহু লোকজন আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠলেন কৌলফ। আবার কি হল কে জানে! ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তাকে দেখেই একজন লোক এসে সেলাম করে বললে, "জনাব, আমাদের সুলতান আপনাকে একবার তলব করেছেন। আর দুই পোষাক পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার জন্য। এটি পরে এখনি চলুন আমাদের সাথে।"

ভারী ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন কৌলফ। কি করা যায়! কিন্তু স্বয়ং সুলতান তলব করেছেন না গিয়ে উপায় নাই। দেলেরাকে

এই কথা জানিয়ে কৌলফ চলে গেলেন সুলতানের লোকের সাথে! খাস কামরায় ছিলেন সুলতান। আশে-পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আমীর ওমরাহরা আর প্রধান উজির মৈনুদ্দিন। সুলতানের লোক কৌলফকে নিয়ে গেল সেখানে। উজির মহাসমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন সুলতানের সামনে। কৌলফ কুর্ণীশ করে দাঁড়াতেই সুলতান হাসিমুখে বললেন, "কি রকম কৌলফ, সব গোল এখন মিটলো তো'। অবাক হয়ে গেল কৌলফ। এ যে সেই সুন্দর ভদ্রলোক! থতমত খেয়ে তিনি সুলতানের পায়ে পড়তে গেলেন। হাসতে হাসতে সুলতান তাকে তুলে বললেন, "আর ভয় নেই কৌলফ। এসব আমারই কারসাজি। তোমার সরল ব্যবহারে আমি বড়ই খুসী হয়েছি। আজ থেকে তুমিও আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হলে। আর তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। এখানেই থাক, কেমন?"—তাই হলো। কৌলফ ও দেলেরা মনের সুখে সেখানে দিন কাটাতে লাগলেন। সুলতান তাদের অসীম প্রেমের কথা সোনার জলে লিখিয়ে রাখলেন, তাঁর খাসকামরার দেয়ালে।



কালেফের কথা

তুরস্কের সুলতান তৈমুর। চারদিকে তাঁর বিষম দাপট। বহুদেশের আমির আর সেখ তাঁর কাছে মাথা নত করে থাকেন। নজর দিয়ে অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁর একমাত্র ছেলে কালেফ। ভারী যোদ্ধা আর তেজীয়ান। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আলির মত বিষম বিক্রমে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করে যুদ্ধ জয় করতেন। তৈমুরের দাপটে রাজ্যে চোর ডাকাতের নাম গন্ধও ছিল না। প্রজারা ছিল খুব সুখে।

এইভাবে দিন যায়। সুলতান ক্রমে বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। এই সময় একদিন কার্জ্জন দেশের দূত এসে উপস্থিত—তুরস্ক দরবারে। কুর্ণিশ করে সে একখানি চিঠি দিল সুলতানের হাতে। সুলতান চিঠিখানি উজিরকে দিয়ে বললেন, "পড়ে শোনাও ত' কার্জ্জনের সুলতান কি লিখেছেন!" উজির পড়তে লাগলেন—'আমি কার্জ্জন দেশের অধিপতি চারিদিকে আমার অখণ্ড প্রতাপ। আমার বাদশাহীর কাছে আর কোন স্বাধীন সুলতান থাকে ইহা আমি চাই না। কাজেই হে তুরস্ক সুলতান, এই পত্রদ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে, পত্র পাওয়া মাত্র এই দূতের হাতে নজরানার অর্থ দিয়া আমার অধীনতা স্বীকার করিবে। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এইজন্য তোমাকে দরবারে হাজির হইতে হইবে না। এইটুকু অনুগ্রহ করিলাম। আশা করি ইহাতে অন্যথা করিবে না। করিলে দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া তোমার দেশ আক্রমণ করিব। মনে রাখিও আমি ঘোড়ার জিনের পাদানিতে এক পা রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছি। —ইতি

কার্জ্জনাধিপতি

বাদশাহ আলি আহাম্মদ,

চিঠি পড়া শেষ হতেই শাহজাদা কালেফ ক্রোধে গর্জ্জে উঠলেন, "কি! এত বড় ক্ষমতা কার্জ্জন সুলতানের যে তুরস্ক সুলতানকে বলে অধীনতা স্বীকার করতে! দিন দেখি উজির সাহেব বেয়াদবের চিঠিখানা।" একটানে চিঠিখানা নিয়ে কালেফ তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেললেন, "এই হল দুষ্টের চিঠির উত্তর।" তারপর দূতের দিকে ফিরে বললেন, "দেখলে তো সব। এখন গিয়ে তোমার মনিবকে বল, সে যত খুশী সৈন্য নিয়েই আসুক না কেন তাদেরও এই দশাই হবে।"

নীরবে কুর্ণীশ করে কার্জ্জন-দূত দরবার থেকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কার্জ্জন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল। চারিদিকে উঠলো সাজ সাজ রব। তৈমুরের পত্র পেয়ে সমস্ত আমির আর সেখেরা এলেন তুরস্ক দরবারে। কালেফ তাঁদের বুঝিয়ে বললেন যে সুলতানের এই বিপদে সকলকেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। নইলে দুষ্ট কার্জ্জন-সুলতান কাউকে রেহাই দেবে না। আমির আর সেখেরা তাতে রাজী হয়ে যার যার দেশে ফিরে গেলেন এবং বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে যোগ দিলেন তৈমুরের সাথে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সৈন্য ছিল—সার্কেসিয়ানের আমির আব্দুল্লার। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। ভারী দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা তারা।

ওদিকে কার্জ্জন—সুলতান দূতের কাছে সমস্ত কথা শুনে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, দাম্ভিক কালেফকে ধরে এনে তাঁর ঝাড়ুদার করে তবে ছাড়বেন। সুলতানের হুকুমে যুদ্ধের সাজ আরম্ভ হল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দুই লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে চললেন তুরস্ক দেশে হামলা করতে। পথে পড়লো কোজণ্ডি নগর আর আইলাক ও সিগালাক দেশ।

সুলতান করলেন কি, ঐ দুই দেশ থেকে প্রচুর রসদ যোগাড় করে তুরস্ক দেশের সীমায় এসে শিবির স্থাপন করলেন।

এই খবর পেয়ে শাহাজাদা কালেফও তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সাতদিন চলার পর রাজ্য সীমান্ত অঙ্গখণ্ডে এসে তিনি কার্জ্জন সুলতানের সম্মুখীন হলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চললো এই যুদ্ধ। কিন্তু কেউ কাউকে হঠাতে পারলো না। পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কিন্তু এবারও সেই অবস্থা। কার্জ্জন সুলতান কিছুতেই কালেফকে হঠাতে পারলেন না। অগত্যা তিনি কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। তিনি জানতেন যে, সার্কেসিয়ানের আমির কালেফের উপর খুব খুশী নন। কেবল উপায় নাই বলেই তিনি তার সঙ্গে যুদ্ধে এসেছেন। সুযোগ পেলে ছেড়ে যেতে মোটেই দ্বিধা করবেন না। এই ভেবে সেই রাত্রে সুলতান গোপনে লোক পাঠালেন আমিরের কাছে চিঠি দিয়ে। চিঠিতে লিখলেন যে, আমির সাহেব যদি তাঁর দলবল নিয়ে কালেফের পক্ষ ছেড়ে চলে যান তবে তিনি তাঁকে স্বাধীন বলে স্বীকার করবেন—আর তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করবেন।

চিঠি পেয়ে সার্কেসিয়ানের আমির তো খুব খুশী। কার্জ্জনের সুলতান যখন তাঁর বন্ধুত্ব চেয়েছেন তখন আর ভয় কিসের! তিনি দূতকে বলে দিলেন, "সুলতানকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবে তাঁর কথামতই আমি কাজ করব। কাল যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একটিও সার্কেসিয়ান সৈন্য দেখতে পাবেন না।" দূত গোপনে এসেছিল গোপনেই চলে গেল। তারপর গভীর রাত্রে সার্কেসিয়ানের আমির দলবলসহ শিবির ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর দেশে। কালেফ তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না।

পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। কালেফ দেখলেন যুদ্ধক্ষেত্রে একটিও সার্কেসিয়ান সৈন্য নাই। তারপর খবর নিয়ে জানলেন গত রাত্রে কখন যে আমির তাঁর দলবল নিয়ে সরে পড়েছেন কেউ তা মোটেই টের পায়নি। প্রথমে একটু দমে গেলেন কালেফ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। আমিরের শয়তানীতে তাঁর মাথায় যেন খুন চেপে গেছে। সমস্ত সৈন্য-সামন্ত একত্র করে তিনি বিপুলবেগে



ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর উপর। রণক্ষেত্রে রক্তের স্রোত বইলো। দেখতে দেখতে শত্রুপক্ষের দশ হাজার সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কালেফ যেন একাই একশো হয়ে লড়াই করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। ধূর্ত্ত কার্জ্জন-সুলতান তাঁর সমস্ত সৈন্য একত্র করে কালেফ ও তাঁর সৈন্যদের ঘেরাও

করে ফেললেন চারদিক থেকে। তাদের প্রবল আক্রমণে কালেফের সেনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে কালেফ তখন শত্রু সৈন্য ভেদ করে পালিয়ে গেলেন যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে।

যুদ্ধ জয় করে কার্জ্জন-সুলতান আমোদ উৎসবে মেতে উঠলেন। এই ফাঁকে কালেফ এলেন রাজধানীতে। বৃদ্ধ তৈমুর সমস্ত শুনে বিষম প্রমাদ গণলেন। বেগম হায় হায় করতে লাগলেন। কালেফ কিন্তু অস্থির হলেন না। তিনি বললেন, “বাবা, এখনই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। নইলে আমরা শত্রুর হাতে পড়ে চরম দুর্দ্দশা ভোগ করব।”

ছেলের কথায় সুলতান ও বেগম রাজী হয়ে বললেন, “যা করবার কর বাপজান, আমরা তো অথর্ব্ব হয়ে পড়েছি—কি করব।” কালেফ করলেন কি, তিনজনের ব্যবহারোপযোগী সাধারণ কিছু পোষাক আর কয়েকটি মূল্যবান হীরা ও জহরত সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাপ মায়ের সাথে। তাঁরা যাবেন বুলগেরিয়া দেশে—এ দেশ ছেড়ে।

বুলগেরিয়ার পথে পড়লো ককেশাস্ দ্বীপ। সেখানে ছিল মস্ত বড় এক ডাকাতের আড্ডা। ডাকাতরা তাঁদের দেখতে পেয়ে ঘেরাও করলো। বৃদ্ধ সুলতান ও বেগম তাদের বললেন, “বাপজানরা, আমাদের যা কিছু আছে সব নিয়ে যাও কিন্তু প্রাণে মেরো না।” তাঁদের কথায় ডাকাত সর্দ্দারের মন একটু নরম হল। সে তাঁদের হীরা জহরত ও পোষাক পরিচ্ছদ কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল।

বিষাদের উপর বিষাদ—সুলতান তৈমুর পাগলের মত হয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন। কিন্তু পুত্র কালেফ তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। বেগম কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলেন না;

অবিরল চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। তখন কালেফ বললেন, "আম্মাজান, অনর্থক কান্নাকাটি করে লাভ কি, খোদা যাকে যেভাবে রাখেন, তাকে সে ভাবেই থাকতে হবে। অভিভূত হলে তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। কাজেই তাঁর উপর নির্ভর করেই চলা উচিত।"

পুত্রের কথায় সুলতান বললেন, "তাই হোক পুত্র, এখন চল, এখান থেকে যত শীঘ্র সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। "একটা লোকালয়ের আশ্রয়ে গেলেই কতকটা শান্তি হবে।



কালেফ বাপ মাকে নিয়ে চললেন লোকালয়ের সন্ধানে। সঙ্গে খাবার নাই কিছুই, বনের ফল আর ঝরণার জল খেয়েই তাঁদের দিন কাটতে লাগলো।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা এলেন এক মরুভূমির ধারে। চারিদিকে ধূ ধূ করছে কেবল বালি আর কাঁকর, গাছপালার নাম গন্ধও নাই। পিপাসায় তাঁদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে অতি কষ্টে তাঁরা চললেন মরুভূমির ধার দিয়ে। এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা এলেন এক পাহাড়ের নীচে। ছোট বড় গাছপালা আছে উহার উপর। দেখে তাঁদের প্রাণে কিছু শান্তি এল। গাছপালা যখন আছে, তখন জলও আছে। কালেফ বাপ মাকে পাহাড়ের নীচে বসিয়ে রেখে বেরোলেন জলের খোঁজে। খাড়া উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠলেন উহার উপরে। উঠেই দেখলেন সেখানে বেশ খানিকটা সমতল জায়গা, আর তাতে অজস্র খেজুর গাছ—পাকা ফলে ভরে আছে। পাশেই একটি সুন্দর ঝরণা, পরিষ্কার টলটলে ফটিক জল ঝরছে তা থেকে। খুসী মনে কালেফ ফিরে এলেন বাপ মায়ের কাছে, তারপর তাঁদের নিয়ে গেলেন সেখানে।

বহুকাল পর খাবার ও জল পেয়ে তাঁদের দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল। এখানে তাঁরা কাটালেন তিন দিন। তারপর শরীর একটু সুস্থ হলে বেরোলেন লোকালয়ের খোঁজে। অতি কষ্টে পাহাড় থেকে নেমে তাঁরা সোজা পথ চলতে লাগলেন—বালি কাঁকরের উপর দিয়ে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটি সহর, সেখানে গেলেই আশ্রয় পাওয়া যাবে। চলতে চলতে তাঁরা সেই সহরে কাছে এসে থামলেন। তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। এই সময় এই বেশে তাঁদের সহরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হল না। এক খেজুর ঝোপের নীচে বসে তাঁরা বিশ্রাম করতে লাগলেন। বসে বসে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছেন, এই সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন সেখানে, এবং তাঁদের সেলাম করে বসে পড়লেন এক পাশে।

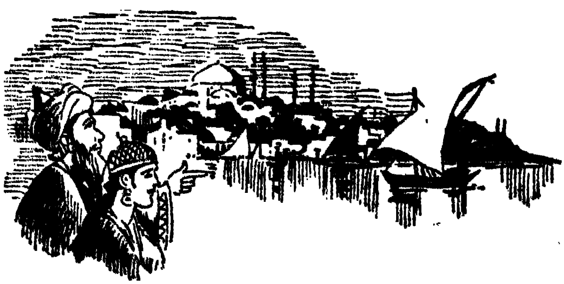
বৃদ্ধ সুলতান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাহেব, এ কোন সহর ?"

বৃদ্ধ বললেন, "এই সহরের নাম জ্যাক সহর। এখানকার

সুলতান হচ্ছেন এলাক্ষিখাঁ। ভারী কড়া শাসক। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের দেখেতো বেশ বড় ঘরের লোক বলেই মনে হচ্ছে। আপনারা আসছেন কোথা থেকে আর যাবেনই বা কোথায় ?”

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুলতান বললেন তাঁদের দুঃখের কাহিনী। তার পর অজস্র চোখের জল ফেলতে লাগলেন অভিভূত হয়ে। সমস্ত শুনে বৃদ্ধ বললেন, “জনাব, এই নিয়ে মন খারাপ করে তো লাভ নেই। খোদা যাকে যে ভাবে রাখেন তাই স্বীকার করে নিতে হবে। এছাড়া আর গতি নেই। আমাকে তো দেখছেন। আমিও বড় ঘরের ছেলে ছিলাম—আর ডাকাতের হাতে পড়ে আমারও আপনাদের মত দশা হয়েছিল। কিন্তু আমি তাতে মোটেই অভিভূত হইনি। খোদার নাম নিয়ে আবার কাজে লেগে গিয়েছি, আর তাতে আছিও মন্দ নয়। আমার বর্ত্তমান আশ্রয় এই সহরেই, চলুন না গরীবের গরীবখানায় গিয়ে যতদিন খুসী বাস করুন, আমিও ধন্য হয়ে যাই।”

বৃদ্ধের কথায় সকলে গেলেন তাঁর বাড়ী। মহাসমাদরে বৃদ্ধ তাঁদের গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর খাওয়া দাওয়া হল, তারপর বৃদ্ধ আরম্ভ করলেন তাঁর জীবন-কাহিনী’—



মোজলের শাহজাদা

মোজল দেশের সুলতান বণাটক ছিলেন আমার পিতা, আমার নাম ফয়জুল্লা। আমি ছিলাম পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। আমার বয়স যখন বিশ বছর তখন তাঁর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দেশ ভ্রমণে। আমার সঙ্গে চল্‌লো একশত অনুচর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, এ ছাড়া রসদপত্র আর সোনাদানাও নিলাম প্রচুর পরিমাণে।

আমি এই ভাবে মোজল থেকে বোগদাদের দিকে এগিয়ে চললাম। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর, একদিন সন্ধ্যার সময় এক মরুভূমিতে এসে উপস্থিত হলাম, এবং আমার অনুচরদের সেখানেই তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলাম। তাঁবু ফেলা হলে পর, খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম আমার বিছানায়। মাঝ রাতে বিষম গোলমাল শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি চারিদিক আলোয় আলোময়, আর বিষম হট্টগোল। তাঁবুতে ডাকাত পড়েছে। বাইরে এসে দেখলুম প্রায় তিনশত ডাকাত আমার অনুচরদের আক্রমণ করেছে। আমিও তখন অনুচরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলাম ; কিন্তু কিছুই করতে পারলামনা, সঙ্গীরা সব একে একে মারা পড়ল ডাকাতদের হাতে। উপায়ান্তর না দেখে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। ভোর সময়ে এক নগরে গিয়ে উপস্থিত হলাম, এবং ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে নগরের ভিতর ঢুকে পড়লাম। মস্ত বড় নগর, বড় বড় রাস্তা, তার দুধারে ছোট বড় নানারকমের বাড়ি ; রাস্তা দিয়ে চল্‌লাম একটু

আশ্রয়ের খোঁজে। শেষকালে এক মসজিদের এতিম খানায় আশ্রয় মিললো। এইভাবে কিছুদিন চল্‌লো। একদিন বেড়াতে বেড়াতে এক মস্ত বড় বাড়ি দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন সময় সেই বাড়ির জানালা খুলে বেরিয়ে এল এক পরমাসুন্দরী যুবতী। তার অপরূপ রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, নির্লজ্জের মত এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার পানে। কিছুক্ষণ পর যুবতী জানালা বন্ধ করে চলে গেল। আমি কিন্তু এক পাও নড়লাম না সেখান থেকে—ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি আবার তার দেখা পাই। কিন্তু আমার আশা সফল হল না।

সেই সময় এক বৃদ্ধ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জনাব, বলতে পারেন এটি কার বাড়ি ?" বৃদ্ধ বললেন, "একটি মোয়াফেকের বাড়ি"। এই বলে তিনি চলে গেলেন, আমি তখন সেখানে থেকে রওয়ানা দিলাম সামনের পথ ধরে।

আনমনে চলতে চলতে এক কবর খানার পাশে গিয়ে থামলাম। রাত তখন গভীর হয়ে এসেছে আর এগোতে ইচ্ছা হল না। কবর খানায় ঢুকে এক জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। শেষ রাত্রে হঠাৎ হাঁক ডাক শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; চোখ মেলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে কবর খানার পাহারওয়ালা। পাহারওয়ালা বললে, "কে তুই, এখানে ঢুকেছিস কেন ?" আমি বললাম, "ভাইসাহেব, আমি বিদেশী মুসাফির, এখানে এসে পড়েছি।" সে অমোর কথা বিশ্বাস করল না একেবারে ধরে নিয়ে গেল কাজির কাছে। কাজির হুকুমে সে রাত্রে আমাকে কয়েদ খানায় আটক থাকতে হল। পরদিন যথাসময়ে কাজী আমায় ডেকে পাঠালেন। কাজী আমাকে বললেন,—"যুবক, তুমি কে ? অত রাত্রে কবরখানায় ঢুকে ছিলে কেন ?" আমি

একে একে সকল কথা বললাম, কিন্তু নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলাম না। মোয়াফেকের কথা শুনে কাজীর চোখে মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি আমাকে বললেন, "যুবক, মোয়াফেকের বাড়ির জানলায় তুমি তার মেয়েকে দেখেছো—ওর মত সুন্দরী এ তল্লাটে আর দুটি নাই। যদিও তুমি সামান্য লোক, তবুও আমি তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। এখন তুমি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

কাজীই তখন মোয়াফেককে ডেকে আনবার জন্য, লোক পাঠালেন। লোক গিয়ে মোয়াফেককে নিয়ে এল। কাজী তাকে দেখে বললেন, "মোয়াফেক, খোদার দোওয়ায় বুঝি আমাদের দু'জনের মধ্যে শত্রুতার ভাব দূর হতে চললো! বসোরার শাহজাদা কাল আমার এখানে এসেছেন এবং তোমার কন্যার রূপ গুণের কথা শুনে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করছেন। এরকম সুযোগ দুবার আসেনা কাজেই যত শীঘ্র শুভ কাজ শেষ হয়ে যায় ততই ভাল।"

মোয়াফেক এই কথা শুনে বললেন, "জনাব, বসোরার শাহজাদা আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন এ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনা তবুও যদি এমন অঘটন ঘটে তবে বুঝবো ইহা খোদার বিশেষ কৃপা আর আপনার মেহেরবানি।"

কাজী বললেন,—"মোয়াফেক, খোদাই একমাত্র মেহেরবান—আমি তুমি কিছু নয়।" পাশের ঘরে বসে আমি সমস্ত শুনছিলাম। তাদের কথা শেষ হতে না হতেই লোকজন এসে কাজীর হুকুমেই আমাকে শাহাজাদার বেশে সাজিয়ে দিলে। শাহজাদার বেশে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম, আমাকে দেখে কাজী সসম্ভ্রমে বললেন, "এই যে শাহাজাদা ইনিই সেই মোয়াফেক, যার মেয়েকে আপনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। খোদার দোওয়ায়

আপনার ইচ্ছা পূর্ণ ই হবে। মোয়াফেক আপনাকে কন্যাদান করতে রাজী আছেন।” কাজীর কথা শেষ হতে না হতেই মোয়াফেক আমাকে বললেন, “শাহাজাদা, আমার মেয়ে যে বসোরার শাহজাদার বেগম হবে এতে আমি ধন্য হয়ে গেছি।” আমি কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কাজী তখন মোয়াফেককে বললেন “তবে আর বিলম্বে কাজ কি? কালই শুভ কার্য্য শেস হয়ে যাক।” খুশিমনে মোয়াফেক বাড়ি চলে গেলেন। পরদিন রাত্রে মোয়াফেকের মেয়ের সহিত মহাসমারোহে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বাসর ঘরে গিয়ে মনে ভারি আনন্দ হল, আমার স্ত্রী জেব্রোদি কেবল রূপবতীই নয়, তার গুণেরও সীমা নাই। এক রাত্রেই আমরা দুজনেই দুজনকে সম্পূর্ণ ভাবে ভালবেসে ফেললাম। রাত ভোর হলে পর হঠাৎ আমাদের দরজায় ঘা পড়ল। দরজা খুলে দেখি কাজীর লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সে বললো “যুবক, তোমার কাজ ত হাসিল হয়েছে, এবার কাজী সাহেবের পোষাকটি ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পোষাক নিয়ে যাও।

আমিও তাই করে ঘরে প্রবেশ করলাম হঠাৎ আমাকে এই বেশে দেখে জেব্রোদি বললে, “প্রিয়তম, এই লোকটা কে? ওকে তোমার পোষাক দিয়ে এই নোংরা পোষাক পরলে কেন?” আমি তখন জেব্রোদিকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সব শুনে জেব্রোদি বললে, “তবে এই সময়ে পোষাক ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য কি?” আমি বললাম, “এ আর বুঝলে না? তোমার পিতার সঙ্গে কাজীর যে শত্রুতা আছে তার কিছু প্রতিশোধ সে এইভাবে নিলে। মূর্খ কাজী জানে না আমি কে। রাস্তার লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছে ভেবে সে খুব খুসি হয়েছে। ভেবেছে, তোমার

পিতা এতে ভারি জব্দ হবেন। কিন্তু তার সে আশায় ছাই পড়বে। আমিও এক সুলতানের ছেলে, মোটেই রাস্তার লোক নই। মৌজলের সুলতান বণাটক আমার পিতা। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, পথে ডাকাতের হাতে পড়ে আজ আমার এই অবস্থা।" এই কথা বলে আমি আমার সমস্ত কাহিনী জেত্রোদির কাছে আগাগোড়া খুলে বললাম।

সমস্ত কথা শুনে জেত্রোদি বললে, "প্রিয়তম, তুমি সাহাজাদা না হয়ে যদি সাধারণ ঘরের ছেলে হতে তাহাতেও আমাদের ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হত না বা আমার পিতা মাতাও বিরক্ত হতেন না। তুমি এখন কিছুদিন কাউকে প্রকৃত পরিচয় দিওনা বা বাড়ি থেকে বেড়িও না। আমি স্থির করেছি কাজীকে খুব ভাল রকম জব্দ করে ছাড়ব; এ জন্য আমাকে একদিন একা বাইরে যেতে হবে। আশা করি এতে তোমার আপত্তি হবেনা।" আমি তাহার কথায় তখনই রাজী হয়ে গেলাম। পরদিন সকালে জেত্রোদি সুন্দর সাজ সজ্জা করে কাজীর দরবারে গিয়ে হাজির হল। খোলা দরবারে হঠাৎ এই রকম অপরূপ রূপবতী মহিলাকে দেখে কাজীর মাথা ঘুরে গেল, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি জেত্রোদির পানে। তার অবস্থা দেখে জেত্রোদি মনে মনে ভারি খুশি হল, সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কাজীকে সেলাম করে বলল, "হুজুরের কাছে আমার একটু আরজ আছে, যদি মেহেরবানি করে একটু নিরিবিলি আসেন তবেই ভাল হয়।" কাজী তখনই জেত্রোদিকে নিয়ে গেলেন তাঁর খাশ খামরায়। পরে বললেন, "সুন্দরী তোমার কি কথা বলবার আছে বল, আমি যথাসাধ্য তাহা পূরণ করতে চেষ্টা করব।"

জেত্রোদি বললে, "হুজুর, আমার কাহিনী বড় দুঃখের। এ

থেকে এক আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না ; তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।” কাজী বললেন, “কি বিপদ বল।”

জেত্রোদি বলল, “দেখুন হুজুর, আমার পিতা আমাকে কিছুতেই বিয়ে দিতে চাননা। বিয়ের আলাপ নিয়ে লোকজন এলে, তাদের কাছে বলেন আমি নাকি কানা, চিররুগী আর বদ্ধ পাগল। আচ্ছা, বলুনতো আমি কি তাই ?”



কাজী বললেন, “কে বলে তুমি তাই ? তোমার মত সুন্দরী একমাত্র বাদশাহের ঘরেই মানায় ; যাক সেজন্য চিন্তা নাই, আমিই তোমাকে বিয়ে করব। তোমার পিতার নাম কি বল, দেখি তিনি এতে কি করে বাদ সাধেন।” জেত্রোদি বললে “হুজুর, আমার পিতার নাম আউস্তাওমার। বাদশাহী মহলের পাশেই যে খেজুর বন আছে না, তার ওপারেই আমাদের বাড়ি।” জেত্রোদির কথা শুনে কাজী বললেন, “সুন্দরী, তোমার কোন চিন্তা নাই এখন বাড়ি যাও। শীঘ্রই আমি তোমাকে

উদ্ধার করে আমার ঘরে নিয়ে আসবো।” খুসিমনে জেত্রোদি বাড়ি ফিরে স্বামীকে সমস্ত কথা বললো। তার কথা শুনে আমি বললাম, “এতে কাজী জব্দ হবে কি করে?” জেত্রোদি বলল, “আউস্তাওমার মেয়ে বাস্তবিকই অতি কুৎসিত আর চিররুগ্না, কাজী ওকে বিয়ে করে এমন জব্দ হবে যে জীবনে তা ভুলতে পারবে না।” এদিকে হয়েছে কি জেত্রোদি চলে যাবার পরই কাজী লোক পাঠিয়ে আউস্তাওমাকে তার বাড়ি নিয়ে এলেন, এবং তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। এই কথা শুনে আউস্তাওমার তো অবাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কাজীকে বললে, “হুজুর, আমার সঙ্গে আপনি তামাসা করছেন নাকি? আমার মেয়ে চিররুগ্না আর অত্যন্ত কুৎসিত। আপনার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া মোটেই শোভা পায় না, এইজন্য আমি তার বিয়ে দেবনা স্থির করেছি।” মৃদু হেসে কাজী বললেন, “আমি জানি আপনি একথা বলবেন। কিন্তু আমি ওতে ভুলবনা। আমি তাকে বিয়ে করবই কোন বাধা মানবো না।” কাজীর কথা শুনে আউস্তাওমার বললে, “হুজুর, আপনার সঙ্গে কেউ বোধ হয় চালাকি খেলেছে। এই বিয়ে হলে আপনি বিষম ঠকে যাবেন, সারাজীবন আপনাকে আপশোষ করতে হবে।” বিরক্ত হয়ে উঠলেন কাজী, কঠোর কণ্ঠে বললেন, “ঠকি আমি ঠকব, তোমার তাতে কি বাবু! আমার কাছে মেয়ের বিয়ে দেবে কিনা তাই বল?” তখন আউস্তাওমার বললে, “বেশ, তাই হবে, কিন্তু এজন্য আমাকে একহাজার সোনার মোহর দিতে হবে।” কাজী তাহাতেই রাজী হলেন। আউস্তাওমার মোহর নিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর কাজী খুসি মনে বিয়ের আয়োজনে লেগে গেলেন। এই খবর শুনে কাজীর স্ত্রী রেগে আগুন হয়ে উঠলেন এবং তাকে যা ইচ্ছা তাই বলে গালমন্দ দিতে লাগলেন।

কাজী তখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

কাজী তখন নতুন বৌয়ের জন্য নানারকম আসবাব পত্র কিনে এনে নতুন ভাবে ঘর সাজাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, কাজী বিয়ের সাজপোষাক পরে গেলে আউস্তা-ওমারের বাড়ি। আউস্তাওমার তাঁকে মহাসমাদরে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে তার মেয়ের সঙ্গে কাজীর বিয়ে হয়ে



গেল। বিয়ের পর কাজী গেলেন বাসর ঘরে, নতুন বৌ সেখানে মস্ত বড় ঘোমটা টেনে বসে ছিল বিছানার উপর। খুশিতে ভরপুর হয়ে কাজী গিয়ে খুললেন নতুন বৌয়ের ঘোমটা; আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে পিছিয়ে এলেন—ঘরের দরজা পর্য্যন্ত—কি বীভৎস চেহারা ঐ স্ত্রীলোকটির। লম্বায় দুহাতের

বেশী হবেনা, চোখ দুটি যেন গর্ত্তের ভিতর ঢুকে আছে, নাক দুটি নাই বললেই হয়, মাত্র দুটি গর্ত্ত। তার মধ্যে আবার দগদগে ঘা তা থেকে সামনে গড়িয়ে পড়ছে পুঁজ। দুর্গন্ধে নিকটে যায় কার সাধ্য! বিষম ক্রোধে কাজী গর্জ্জে উঠলেন, "আউস্তাওমার,—' হাত জোড় করে আউস্তাওমার এসে দাঁড়াল কাজীর সামনে।

দাঁতে দাঁত চেপে কাজী বললেন, "শয়তানীর আর যায়গা পাওনি, তোমার সেই সুন্দরী মেয়ে কোথায়, তাকে নিয়ে এস।" কাতর কণ্ঠে আউস্তাওমার বললে, "আমিতো আগেই বলেছি হুজুর আমার মেয়ে অত্যন্ত কুরূপা, সুন্দরী মেয়ে কোথা পাব বলুন।" কাজী বললেন, "এ যে মূর্ত্তিমতী দুঃস্বপ্ন।" আউস্তাওমার বললে, "এ কথাতো আমি আগেই বলেছি হুজুর, কিন্তু আপনি আমার কথায় তখন মোটেই কান দিলেন না। এখন আমি কি করি বলুন।" স্তব্ধ হয়ে রইলেন কাজী কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "কিন্তু সে দিন যে এক অপরূপ রূপসী আমার কাছে গিয়ে বললে, তোমার মেয়ে, তুমি তাকে বিয়ে দিতে চাওনা। সে তবে কে?" আউস্তাওমার বললে, "জানিনা হুজুর, বোধ হয় কেউ আপনাকে জব্দ করবার জন্য এরকম করেছে।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাজী বললেন, "আচ্ছা জব্দ করেছে বটে, এখন এক কাজ কর, এ কথা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সে দিকে দৃষ্টি রেখো; আমি তোমার মেয়েকে এখনি তালাক দিচ্ছি, আর তোমাকে যে সোনার মোহর দিয়েছি তাও আর ফেরত দিতে হবেনা।" এই কথা বলে কাজী আউস্তাওমারের মেয়েকে তালাক দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

কথা কানে হাটে। দেখতে দেখতে একথা সহরময় ছড়িয়ে পড়ল। লোকের হাসি ঠাট্টায় কাজী আর বাড়ি থেকে বের হতে

পারেন না। এদিক আমি করলাম কি, মোয়াফেকের পরমর্শ মতো বোগদাদের খলিফার সঙ্গে দেখা করলাম। আমার পরিচয় পেয়ে খলিফা অনুযোগ করে বললেন, "তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু। সহরে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন, তা হলে তো আর তোমার এভাবে ভুগতে হয় না। যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমি লোক দিচ্ছি তুমি তোমার পিতার কাছে পত্র লেখ।" এই কথা বলে খলিফা আমাকে একখানি বহুমূল্য তরবারি আর একটি হীরার আংটি উপহার দিলেন। আমি খলিফাকে কুর্ণীশ করে মোয়াফেকের বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিন খলিফার লোক মারফত আমি পিতার কাছে একখানি পত্র পাঠিয়ে দিলাম।

দিন পনর পর খলিফার লোক ফিরে এল মৌজলের দূতকে সঙ্গে নিয়ে। মৌজলের দূত আমার সঙ্গে দেখা করে বললে, "শাহাজাদা, আপনি ডাকাতের হাতে পড়েছেন শুনে স্বয়ং সুলতান বহু সৈন্য নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন। সুলতানের সহিত যুদ্ধে ডাকাতের দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু আপনাকে দেখতে না পেয়ে সুলতান একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, আপনি নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে মারা পড়েছেন। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সেই যে তিনি শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর আপনার চাচার ছেলে আমেদ সিংহাসনে বসলেন, কিন্তু এখন আপনি বেঁচে আছেন জেনে আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আপনি সেখানে গেলেই তিনি আপনাকে সিংহাসন ছেড়ে দেবেন।"

দূতের কথা শুনে মনে অত্যন্ত আঘাত লাগলো। আমারি জন্য আমার পিতা অকালে প্রাণ ত্যাগ করলেন এ দুঃখ রাখবার স্থান নাই। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে দেখা করলাম খলিফার সাথে। পিতার মৃত্যুতে তিনিও খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন, তারপর আমাকে দেশে

পাঠানোর বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমি শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে স্ত্রী জেত্রোদিকে নিয়ে দেশে রওয়ানা হলাম। খলিফার সৈন্যরা আমাদের দেশে পৌঁছে দিয়ে গেল। দেশের সকলে মহাসমাদরে আমাদের গ্রহণ করল। শুভ দিনে আমি মৌজলের সিংহাসনে বসলাম। আমোদ হলেন আমার প্রধান উজির। এইভাবে সুন্দরী ও গুণবতী স্ত্রী এবং প্রজাদের ভালবাসা পেয়ে আমি বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলাম। একদিন দরবারে বসে আছি এমন সময় এক ফকির এসে দাঁড়াল আমার সামনে। বেশ লম্বা চওড়া তার চেহারা, মুখময় লম্বা দাঁড়ি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটিতে যেন বাজ পাখীর দৃষ্টি। কি জানি কেন তাকে আমার ভারি ভাল লেগে গেল, আমি তাকে আমার সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করলাম।

ফকির রোজ দরবারে আসে, হাস্য পরিহাসে সকলকে মোহিত করে, এই ভাবে দিন যায়। দিন দিন সে আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। আমি যখন যেখানে যাই, সে আমার সঙ্গে থাকে। একদিন আমি তাকে নিয়ে গেলাম শিকার করতে। গভীর বনের ভেতর দিয়ে চলেছি দুজনে, হঠাৎ ঝোপের মধ্য হতে বেরিয়ে এল এক হরিণ, যেমন রং তেমন তার গড়ন। আমাদের দেখেই প্রথমে সে থতমত খেয়ে গেল, তারপর সোজা সামনের দিকে ছুট দিলে।

আমরা দুজনেও তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। সামনেই বেশ খানিকটা খোলা ময়দান, তারপর আবার গভীর বন। হরিণটা ছুটলো ময়দানের উপর দিয়ে। আমরা দেখলাম এই সময় ওকে ঘায়েল না করলে পালিয়ে যাবে বনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে তীর ছুড়লাম হরিণটাকে লক্ষ্য করে। আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, কিন্তু ফকিরের

তীর গিয়ে বিঁধলো তার পেটে ; একেবারে এ ফোঁড় ও ফোঁড়। ধপ করে পড়ে গেল সে মাঠের উপর।

হরিণটাতো মারা পড়লো, এটাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু লোকজন সব বহু পিছনে পড়ে আছে, তারা না আসা পর্য্যন্ত



দুজনে সেখানে বসে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলাম। কথায় কথায় ফকির বললে, "জাঁহাপনা, দেশ বিদেশ ঘুরে দেখেছিও অনেক, আর শিখেছিও অনেক কিছু, আমি মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি।" তার কথা শুনে আমি বললাম, "যদি তাই হয় তবে এই হরিণটাকে বাঁচাও দেখি, তাহলে বুঝবো তোমার কথা সত্যি।"

ফকির তখন করলো কি, মরা হরিণটার কাছে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দেখতে দেখতে হরিণটা বেঁচে উঠলো আর ফকিরের দেহটা পড়ে গেল মাটিতে। তারপর আবার ফকির বেঁচে উঠলো আর হরিণটা মরে গেল। সব দেখে শুনে আমি ত অবাক, একেবারে অসাধ্য সাধন! ধরে পড়লাম ফকিরকে, "আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে তোমার ঐ বিদ্যা, আমি তোমাকে লক্ষ মোহর পুরস্কার দেব।" ফকির বললে, "এর জন্য আবার পুরস্কার কি জাঁহাপনা। আপনার কাছে আছি, আপনাকে শেখাবনাতো কাকে শেখাব।"

এই কথা বলে ফকির আমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে বললো, "মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে হরিণটার দিকে তাকিয়ে থাকুন, দেখবেন আপনার আত্মা ওর ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়েছে। ঢুকবার সময় কিন্তু দশ বার জপ করতে হবে। আবার বেরোবার সময় জপ করতে হবে পাঁচ বার, এতে যেন ভুল না হয়।" আমি প্রথমে মন্ত্রটি ভাল করে মুখস্থ করলাম, তারপর হরিণটার দিকে তাকিয়ে জপ করলাম দশ বার। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা বেঁচে উঠলো, আর আমার দেহ পড়ে রইল মাটির উপর। ভারী খুসী হলাম এ দেখে। কিন্তু এতেই হল আমার সর্ব্বনাশ। আমি যেই হরিণটার ভিতর ঢুকেছি, অমনি ফকির মন্ত্রবলে আমার দেহে ঢুকে পড়লো। তারপর বর্শা হাতে তেড়ে এল আমাকে মেরে ফেলবে বলে। কি আর করি প্রাণভয়ে ছুট দিলাম বনের ভিতর।

এইভাবে আমার প্রাণরক্ষা হল। ফকির তখন আমার দেহ ধারণ করে চলে গেল রাজধানীতে। আমিই আবার ফিরে এসেছি ভেবে সকলে যেমন অভ্যর্থনা করে তেমনি করল। ফকির তখন আমার তক্তে বসে রাজ্য শাসন ও জেম্রোদির সঙ্গ

পেয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলো। দুষ্ট কিন্তু এতেও খুসী হল না ; আমাকে একেবারে শেষ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। অনেক ভেবে চিন্তে সে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিল যে, বনের সমস্ত হরিণ মেরে ফেলতে হবে। যে কেউ হরিণ মেরে এনে তাকে দেখাবে, তাকেই সে দশটি সোনার মোহর পুরস্কার দেবে।

আর যায় কোথায়। রাজ্যের লোক লেগে গেল হরিণ মারতে। এসব দেখে আমি পালাতে লাগলাম সেখান থেকে। কোথায় যাব তার ঠিক নেই, সামনে ছুটে চলেছি, ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ; হঠাৎ দেখি সামনে পড়ে আছে এক মরা বুলবুল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ভিতর ঢুকে পড়লাম, তারপর উড়তে উড়তে চলে গেলাম একেবারে আমার শাহীমহলে। জেম্রোদির মহলের পাশেই ছিল একটি লম্বা ফুলের গাছ ; তার ডালে বসে আমি অনবরত শীষ দিতে লাগলাম।

বুলবুলির মিষ্টি আওয়াজ শুনে জেম্রোদি জানালার কাছে এল, আমিও উড়ে গিয়ে বসলাম একেবারে তার হাতের উপর। পোষা পাখী ভেবে জেম্রোদি আদর করে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগল ; আমিও আনন্দে শীষ দিতে লাগলাম। খুসী হয়ে সে আমাকে এক সোনার খাঁচায় রেখে দিল। এইভাবে আমি আবার জেম্রোদির কাছে এলাম। রোজ সকাল সন্ধ্যা তাকে গান শুনাই, আর সেও খুসী হয়ে আমাকে আদর করে আর ভাল ভাল খাবার দেয়। ক্রমে আমি তার এমন নেওটা হয়ে পড়লাম যে, সে আমাকে দিনের বেলা ছেড়ে দিত যাতে আমি খোলা হাওয়া খেতে পারি। আমি কিন্তু তাকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না, থেকে থেকে উড়ে আসতাম তার কাছে ; হাতের উপর বসে শীষ দিতাম আর আদর করতাম তার রাঙ্গা ঠোঁটের

উপর ঠোঁট ঘষে। সেও চোখ বুজে তা উপভোগ করত আর বলত, "এ বুলবুল আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়, এ না থাকলে আমি আর বাঁচবো না। এইভাবে দিন বেশ কাটতে লাগলো, কিন্তু দুষ্ট ফকিরকে দেখলেই আমার প্রাণে যেন আগুন জ্বলে উঠতো। দুষ্ট শয়তানটা আমারি সামনে আমার প্রিয়তমার সঙ্গে রঙ্গ রহস্য করতো—একি সহ্য করা যায় বলুন!

এইভাবে সুখে দুঃখে কাটতে লাগলো আমার দিন—এ যেন আর ফুরায় না। শেষে একদিন খোদা মুখ তুলে চাইলেন। জেম্রোদির একটি পোষা মাদীকুকুর ছিল, তার বাচ্চা হবে। আমার খাঁচার নীচেই তার থাকবার জায়গা। কয়েকদিন পর কুকুরটির বাচ্চা হল। বাচ্চা হতেই সে সেই যে সেখানে শুয়ে পড়লো আর উঠলো না। উত্তম সুযোগ বুঝে আমি গিয়ে ঢুকে পড়লাম তার দেহে, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা বেঁচে উঠলো আর খাঁচার মধ্যে পড়ে রইল বুলবুলের মরা দেহ।

জেম্রোদি সেই সময় ঘরে ছিলনা; ফিরে এসে দেখে বুলবুলটা মরে পড়ে আছে। দেখে তার সে কি কান্না! খাওয়া দাওয়া রইল পড়ে, মরা বুলবুলটাকে বুকে ধরে অনবরত সে চোখের জলে ভাসতে লাগলো। খবর গেল ফকিরের কাছে। ছুটে এলো সে জেম্রোদির ঘরে, কত কিছু বলে বুঝাতে লাগলো তাকে কিন্তু কিছুতে কিছু হলনা। জেম্রোদি কাঁদতে লাগলো অঝোরে। উপায়ান্তর না দেখে দুষ্ট ফকির তখন বললে, "জেম্রোদি, একটু চুপ কর, আমি এখনই তোমার বুলবুলকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলেই সে বুলবুলটার দেহে ঢুকে পড়লো, আর আমার দেহ পড়ে রইলো বিছানার উপর। এইরকম একটা সুযোগেরই আমি অপেক্ষা করছিলাম, মরা বুলবুলটা বেঁচে উঠতেই আমি আবার আমার দেহে গিয়ে প্রবেশ

করলাম এবং একলাফে উঠে সেই বুলবুলটার মাথা ছিঁড়ে মেরে ফেললাম।

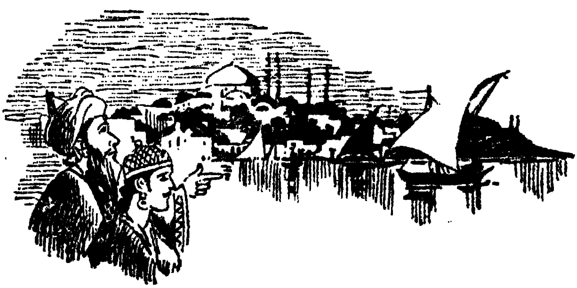
এই কাণ্ড দেখে জেম্ব্রোদিও হতভম্ব। ধরা গলায় সে বললে, "জাঁহাপনা, একি করলেন, বাঁচিয়ে দিয়ে আবার ওকে মেরে ফেললেন কেন ?" আমি তখন তাকে আগা-গোড়া সমস্ত



ঘটনা খুলে বললাম। ফকিরের মরা দেহ তখনো বনের ভেতর পড়েছিল ; তা আনিয়ে তাকে দেখালাম। ফকিরের দেহ দেখে সে আমার কথা বিশ্বাস করলো বটে কিন্তু তার মনের শান্তি চলে গেল, চিরদিনের জন্য। স্বামী ভেবে সে যে এতদিন একটা দুষ্টের সেবা করেছে এই ভেবে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো। আমি তাকে কত বুঝালাম যে এতে তার কোন দোষ নেই, আত্মাটা তার ছিল বটে কিন্তু দেহটা ত' আমারই ছিল, আর সে জেনে শুনে একাজ করেনি তবে আর কি। কিন্তু কিছুতেই সে শান্ত হল না, দিন রাত ভেবে ভেবে শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে গেল। বহু চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলাম না, একদিন

সন্ধ্যার সময় সে আমার কাছে মাফ চেয়ে চিরকালের জন্য চোখ বুজলো।

সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনের শান্তি চলে গেল চিরকালের জন্য। তার শেষ কাজ করে আমার চাচার ছেলে আমেদকে বসালাম তক্তে, তার পর ফকিরের বেশে বেরিয়ে পড়লাম পথে পথে। যেখানেই যাইনা কেন শান্তি হয় না কিছুতেই, দিনরাত কেবল জেস্মোদির কথা মনে পড়ে। এই ভাবে দেশ বিদেশ ঘুরে এখন এখানে এসে আস্তানা করেছি; যাব আর কোথায়, তার চেয়ে এক যায়গায় বসেই তার কথা চিন্তা করি। খোদায় দোওয়ায় একটি কাজও জুটেছে ভাল। এখানকার সুলতান আমাকে ভালবেসে তাঁর ভ্রমনের সঙ্গী করেছেন কোথাও বেড়াতে যেতে হলেই আমাকে সঙ্গে নেন, আর কিছুই করতে হয় না। খাওয়া থাকা থেকে পোযাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত সব কিছুই সরকার থেকে আসে। এত সব পেয়েও আমি জেস্মোদিকে ভুলতে পারিনি, দিন রাত তার কথা মনে পড়ে কষ্টেই দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু তবুও মন শক্ত করে আছি, কি করি অস্থির হলেও! তাকে আর ফিরে পাব না!



কালেফের শেষ কথা

ফয়জুল্লার কথা শেষ হইলে বৃদ্ধ সুলতান তৈমুর বললেন, "জনাব, আপনি একজন আদর্শ প্রেমিক। রাজ্য ধন ছেড়ে প্রেমের জন্য এভাবে জীবন কাটাতে পারে এমন লোক আমি ত' দেখিনি জীবনে, অন্যের কথা বলতে পারি না।" কালেফ বললেন, "বাস্তবিকই আপনার আদর্শ অনুসরণ যোগ্য। দুঃখে অভিভূত না হয়ে আপনারই মত মন দৃঢ় করা উচিত, নইলে দুঃখ দূর না হয়ে আরো জোরে চেপে ধরবে।"

এই ভাবে কথাবার্ত্তার পর সকলে বিশ্রাম করতে গেলেন। তিনদিন ফয়জুল্লার বাড়িতে বিশ্রাম করে তিনজন আবার বেরিয়ে পড়লেন, আর আটক নদী পার হয়ে বার্লাস দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগলো; মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর তেজ আর নীচে বালু তেতে উঠেছে; পথ যেন ফুরাতে চায় না। অতি কষ্টে পথ চলে তাঁরা এসে উঠলেন এক সরাই-খানায়। এখানে বিনা অর্থে থাকা যায়, কিন্তু খাবার কোন বন্দোবস্ত নাই। রান্নার উনুন তৈয়ার আছে, খাবার জিনিষ নিজেরা আন—, রাঁধ, খাও—এই হল এখানকার নিয়ম। বাপ মাকে এক ঘরে রেখে কালেফ বেরোলেন ভিক্ষা করতে। ভিক্ষা করে মিললো মাত্র কিছু আটা আর খেজুর। তাই নিয়ে এসে কালেফ রুটি তৈয়ার করলেন নিজের হাতে, তারপর তিনজনে খেলেন সেই রুটি আর খেজুর। ছেলের অবস্থা দেখে বৃদ্ধ তৈমুরের বুক ফেটে যেতে লাগলো। অতি কষ্টে কোনরকম সামলে রইলেন তিনি। বেগমের কিন্তু ইহা মোটেই সহ্য হল না; অঝোরে তিনি চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

পরদিন আবার কালেফ বেরিয়েছেন ভিক্ষায়। পথের ধারে মস্ত বড় এক গাছ। তার নীচে দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, গাছের ডালে বসে আছে এক বাজ পাখী। শিকারে বাজ পাখী, গলায় তার একগাছি সোনার হার চক চক করছে। এ নিশ্চয়ই কোন বড়লোকের পোষা পাখী, বোধ হয় শেকল খোলা পেয়ে



পালিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে কালেফ ডাকলেন, "চুঁ-চুঁ—আয় আয়—"। সঙ্গে সঙ্গে পাখীটি উড়ে এসে তাঁর হাতে বসলো। পাখীটি ধরে তিনি চললেন সহরের দিকে। ইচ্ছা, যার পাখী তাকে দিলে যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়!

এই বাজটি হচ্ছে এদেশের সুলতানের পোষা পাখী। ভারী শিকারী বাজ, সুলতান তাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। হঠাৎ দাঁড়ের শেকল খোলা পেয়ে পালিয়ে এসেছে। সুলতান ঘোষনা করেছেন,

যে তাঁর পাখীটি ধরে দিতে পারবে তাকে দেবেন বিশেষ পুরস্কার। কালেফের হাতে পাখী দেখে লোকে বলাবলি করতে লাগলো, "দেখেছ ; লোকটার কি নসীব, সুলতানের কাছ থেকে মোটা রকম আদায় না করে ছাড়বে না।" পাখীটিকে নিয়ে কালেফ দেখা করলেন সুলতানের সাথে। প্রিয় পাখীটিকে পেয়ে সুলতানের আনন্দ আর ধরে না। তখনি তাকে শেকল পড়িয়ে তারপর কথা আরম্ভ করলেন কালেফের সাথে। সুলতান বললেন, "তুমি আমার যে উপকার করলে তার দান নাই। তবুও আমার ঘোষণা মত তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাই ; কি চাও বল।"

কালেফ তখন তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিয়ে বললেন, জাঁহাপনা, আমার বৃদ্ধ বাপ মাকে সরাই খানা থেকে নিয়ে আসুন আপনার এখানে, তাহলেই আমার পুরস্কার পাওয়া হবে।"

কালেফের পরিচয় পেয়ে সুলতান আরও খুসী হলেন, এবং তখনই বৃদ্ধ তৈমুর আর তাঁর বেগমকে নিয়ে এলেন সুলতানী মহলে। বহুদিন পর আদর যত্ন পেয়ে দুজনে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন। বার্লাস সুলতান কালেফকেও তাঁর সহচর হিসাবে গ্রহণ করলেন। বেশ সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগলো।

কালেফ দিন দিন সুলতানের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে সুলতানের মেয়ে শাহজাদী নুরুন্নেসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের পরদিন কনে এসে শ্বশুর শাশুড়ীকে অভিবাদন করলেন। বৃদ্ধা বেগম পুত্রবধূকে কোলে নিয়ে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। সহানুভূতির স্বরে নুরুন্নেসা বললেন, "কাঁদছেন কেন আম্মাজান ? আমাকে পেয়ে কি আপনার মনে সুখ হচ্ছে না ?"

চোখের জল মুছে বৃদ্ধা জড়িয়ে ধরলেন বধূকে একেবারে বুকের মধ্যে তারপর বললেন, "বলিস কি মা ? তোকে পেয়ে আমরা বেঁচে গেছি কিন্তু সময় মত পেলাম না এই দুঃখে কাঁদছি।"

শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিয়ে নুরুন্নেসা-সোজা চলে গেলেন পিতার কাছে। খাসকামরায় বসে সুলতান কথা বলছিলেন উজিরের সাথে। মেয়েকে দেখে তিনি হেসে বললেন, "কিরে বেটী, শ্বশুর শাশুড়ীকে কেমন লাগলো ?"

গম্ভীর ভাবে নুরুন্নেসা বললেন, "বেশ ভালই লেগেছে বাবা, কিন্তু আমি যে বিশেষ জরুরী কাজে এসেছি আপনার কাছে।"

স্নেহমাখা স্বরে সুলতান বললেন, "বল মা, কি তোমার কাজ ? এ বড়ো ছেলে তোমার আশা অপূর্ণ রাখবে না।"

নুরুন্নেসা বললেন, "বাবা, সুলতানের ছেলের বৌ হলাম বটে কিন্তু রাজ্যতো পেলাম না।"

মেয়ের কথায় সুলতান কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "তাই হবে মা, তোর রাজ্য আমি তোকে পাইয়ে দেবই। এতে যা হয় হোক।"

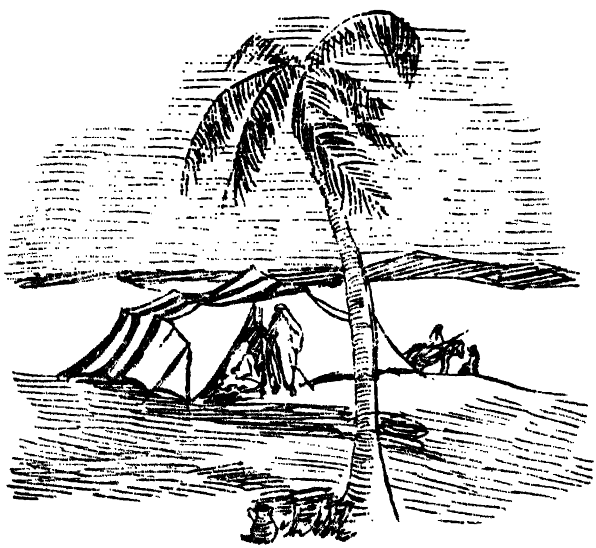
সুলতানের হুকুমে রাজ্যময় সাজ সজ রব পড়ে গেল। বার্লাস রাজ্যের শেষে বিখ্যাত মোঙ্গল সুলতান হুলাগুখানের রাজ্য। হুলাগুখানের বোন বিয়ে করেছেন বার্লাস সুলতান। নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনিও এলেন তাঁর বিশাল মোঙ্গল বাহিনী নিয়ে। দুই রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্য গিয়ে আক্রমণ করলো কার্জনদেশ। কার্জন সুলতানও তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেন। তিনদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চললো দুপক্ষে। কালেকের বিক্রমে কার্জন সুলতান পরাস্ত ও নিহত হলেন। তাঁর সমস্ত সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল। বৃদ্ধ তৈমুর তখন সকলকে নিয়ে

আবার ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে। তারপর পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

গল্পটি শেষ করে ফতিমা বললে, "কেমন লাগলো আম্মাজান এই গল্পটি ?" ভুরু কুঁচকে শাহজাদী বলবেন, "এ আর এমন কি ? কালেফের চরিত্রে কোন প্রেমের লক্ষণ ত' পেলাম না। আর ফয়জুল্লা ! সেও আর তেমন কি ? প্রণয়িনীকে হারিয়ে বেঁচে রইলো ত' ! যদি সেও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করতো তবে বুঝতাম সে যথার্থই প্রেমিক। তুমি যাই বলনা কেন দাইমা, পুরুষ কখনো ওরকম হতে পারেনা।"

ফতিমা বললে, "তা বোন, তুমি যদি নুরুদ্দিন ও রাবেয়ার কাহিনী শোন তবে তোমার এ মত বদলাতে হবে। শাহজাদী বললেন, "বেশ, সুরু করে দাও তোমার নুরুদ্দিন-রাবেয়ার গল্প। শুনি তাতে কি আছে"।

শাহজাদীর কথায় ফতিমা তার গল্প আরম্ভ করলো,—



নুরুদ্দীন ও রাবেয়ার কথা

আন্ধারার বনভূমি। চারদিকে উঁচু নীচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে অজস্র বন জঙ্গল আর ছোট বড় গাছ—হরেক রকমের। পাহাড়ের নীচে বেশ খানিক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে ঐ বন জঙ্গল আর গাছপালা। তার ফাঁক দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট বড় পাহাড়ী ঝরণা ধারা—এঁকে বেঁকে বড় নদীর দিক পানে। টল টলে ফটিক জল কল কল শব্দে ছুটে চলেছে বালি পাথরের উপর দিয়ে, চারদিক মুক্তা ছড়িয়ে।

সে দিন ছিল গ্রীষ্মের বিকাল বেলা। সারাদিন চারদিকে আগুন ছড়িয়ে সাঁজের সূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে, এমন সময় বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একটি ছোট্ট হরিণ, লাল্‌চে বাদামে রং, তার উপর সাদা গোল গোল চক্কর, মাথার শিং এখনো তেমন বাড়তে পারেনি। হরিণটি ছুটে চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। তার পেছনে তাড়া করে আসছেন এক অপরূপ রূপবান যুবক—তেজী ঘোড়ায় চড়ে, চকচক করছে তাঁর হাতে তীক্ষ্ণ-ধার বল্লম—হরিণটির দিক পানে ফলাটা ফেরালো।

ছুটতে ছুটতে হরিণটি ঝরণার ধারে এসে পড়লো, শিকার পালায় দেখে যুবকটি সজোরে ছুঁড়ে মারলেন তার বল্লম—হরিণকে লক্ষ্য করে। চকিতে সে মারলে লাফ, একলাফে ঝরণা পার হয়ে হরিণটি গিয়ে পড়লো ওপারে—তারপর মিলিয়ে গেল গভীর জঙ্গলের ভেতর। ঘোড়াটি ছুটছিলো তীরের মত, বল্লম ছোড়ার সময় সেও মারলে লাফ, লক্ষ ভ্রষ্ট হয়ে বল্লমটা গিয়ে পড়লো

ঘাস বনের ভেতর—আর টাল সামলাতে না পেরে যুবকটি উল্টে পড়ে গেলেন নীচে—শক্ত বেলে পাথরের উপর। ছড়ে গেল তাঁর হাত পা কয়েক যায়গায়, আর মাথায় লাগলো বিষম চোট, একেবারে বেহুঁস।

নীচে ঝরণার জলে দাঁড়িয়ে ঘড়াতে জল ভরছিল রাবেয়া। তন্বী যুবতী, বসরাই গোলাপের মত তার গায়ের রং, টানা-টানা চোখ, ডালিম ফুলের পাঁপড়ীর মত রাঙ্গা পাতলা দুখানি ঠোঁঠ, টিকোলো নাক, পীনোন্নত বক্ষ আর অপূর্ব্ব নিটোল তার দেহের গড়ন—স্নিগ্ধ লাবণ্য ঝরে পড়েছে সারা অঙ্গ বেয়ে। হুড়মুড় শব্দ শুনে সে মুখ তুলে চাইলো তারপর ছুটে গেল সেখানে। যুবকটি তখনও বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন বালি পাথরের উপর। রাবেয়া তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে এলো তার জল ভরা ঘড়াটা তারপর আঁচলা করে জল ঢালতে লাগলো যুবকটির মাথায়।

কিছুক্ষণ পর যুবকটির জ্ঞান ফিরে এলো, তিনি চোখ মেলে চাইলেন কিন্তু ভাল করে দেখতে পেলেন না কিছু, মাথাটা এখনো ঝিম ঝিম করছে—আপনা আপনি আবার বুঁজে এলো তার চোখ দুটি। চোখ বুঁজে তিনি বললেন, "উঃ—" রাবেয়া তার ওড়না দিয়ে বাতাস করছিলো যুবকটির মাথায়, জ্ঞান হয়েছে দেখে সে অধীর কণ্ঠে বললে, "কেমন আছেন জনাব, খুব লেগেছে কি?" কি মধুর স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর! মুগ্ধ হয়ে গেলেন যুবক, চোখ মেলে দেখলেন—একখানি অনিন্দ্য সুন্দর মুখ তাঁর মাথার উপর নত হয়ে আছে—যেন সদ্য প্রস্ফুটিত বসরাই গোলাপ। যুবকটি চোখ মেলে চাইতেই রাবেয়ার মুখখানি খুসীতে ভরে উঠলো, সে ধীরে ধীরে বললো, "খুব লেগেছে কি?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যুবকটি বললেন, "হাঁ, মাথাটা বড্ড কন কন করছে, শরীর নাড়তে পারছিনা।"

সস্নেহে রাবেয়া যুবকের মাথায় হাত বুলোতে লাগলো, এলো মেলো চুল,—অজস্র বালু আর কাঁকড় ঢুকেছে তার মধ্যে। চুল পরিস্কার করতে গিয়ে রাবেয়া চমকে উঠলো, কি সর্ব্বনাশ! মাথা কেটে যে একেবারে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে, তাড়াতাড়িতে সে দিকে তার দৃষ্টি পড়েনি একেবারে। সন্তর্পনে মাথাটি বাঁ হাতে তুলে ধরে রাবেয়া কাটা যায়গাটায় জল-ধারা দিতে লাগলো



ডান হাতে। কিছুক্ষণ পর রক্ত পড়া কমে এলো, রাবেয়া তখন জল দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে দিলে তাঁর চুলগুলো, তারপর অতি সাবধানে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে রাখলো পরিস্কার শুকনো ঘাসের উপর। নাড়া চড়া পেয়ে আবার রক্ত বেরোতে লাগলো তার কাটা যায়গা থেকে। দেখে রাবেয়া উঠে দাঁড়ালো তারপর ছুটে গেল পাশের জঙ্গলের ভেতর, সেখান থেকে নিয়ে এলো গোটা কয়েক সরু সরু গাছের পাতা; পাতাগুলো হাতের তালুতে রগড়ে

সে লাগিয়ে দিল যুবকটির কাটা যায়গায়—আঙ্গুল দিয়ে টিপে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল, রাবেয়া তখন বললে, "রুমাল টুমাল কিছু আছে জনাব? এখনি বেঁধে দিতে হবে শক্ত করে, নইলে ওষুধটা পড়ে যাবে আবার রক্ত বেরোবে অঝোরে।"

যুবকটি বললে, "রুমাল টুমাল তো সঙ্গে আনিনি, একটি পাগড়ী ছিল তাও ছুটোছুটির ভিতর কোথায় যে পড়ে গেছে বলতেই পারি না, উঃ—"

বেদনায় ভরে উঠলো রাবেয়ার সুন্দর মুখখানি মুহূর্ত্তে কি চিন্তা করলো সে, তারপর তার ওড়নাখানা দিয়ে অতি সন্তঃর্পনে বেঁধে দিলো যুবকটির কাটা যায়গা—বেশ শক্ত করে সারা মাথায় জড়িয়ে। বাঁধা শেষ হলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাবেয়া বললে, "যাক এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এ বাঁধন যেন খুলবেন না আজ দিন-রাতের ভেতর, কাল ভোরে খুললে আর কোন অনিষ্ট হবে না।"

যুবকটি বললেন, "তাই হবে, কিন্তু বড্ড যে তেষ্টা পেয়েছে—একটু জল খাওয়াতে পার? রাবেয়া তক্ষুনি জল এনে তাকে খাইয়ে দিলে।

জল খেয়ে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন রাবেয়ার মুখোমুখী। কি অদ্ভুত এই মেয়েটি! যেমন রূপ তেমনি গুণ, কত মেয়েইত দেখেছেন তিনি কিন্তু এর সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না, কি শান্ত স্নিগ্ধ ওর গায়ের রং আর চোখের চাউনি; পীড়া দেয় না মোটেই কেমন যেন একটা আবেশ এনে দেয় মনের ভেতর, আবার তেমনি স্নেহপরায়ণা; কে এই যুবতী! গাঢ় স্বরে যুবক বললেন, "কে তুমি বেহেস্তের দেবী, আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে?"

মৃদু মধুর হাসিতে ভরে উঠলো রাবেয়ার মুখ, স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে

বললে, "আমি মোটেই হুরী পরী নই জনাব—সামান্য মানুষ মাত্র। গরীব চাষীর মেয়েকে এতদূর উঁচিয়ে লজ্জা দেবেন না।"

ধরা গলায় যুবক বললেন, "চাষীই হও আর যেই হও আমার কাছে তুমি বেহেস্তের দেবী, এছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারিনা।"

রাবেয়া বললেন, "সে জনাবের মেহেরবানি—আমার কিছু বলবার নেই।" এইভাবে দুজনে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় সামনের বনের ভেতর শব্দ হ'লো, "শাহজাদা নুরুদ্দীন দীর্ঘজীবী হোন—" একসঙ্গে অনেক লোকের কণ্ঠ। শব্দ শুনে যুবকটি একটু জোরে বললেন, "এই যে ভাই সাদত, আমি এখানে।" সঙ্গে সঙ্গে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একজন তরুণ যুবক—ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার পেছনে একদল সেপাই। ঘোড়ার উপর থেকে নেমে যুবকটি ছুটে এলো নুরুদ্দীনের কাছে, ধীরে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললো, "এ কি করে হলো শাহজাদা! গায়ের আচকান যে একেবারে রক্তে লাল হয়ে গেছে!"

ধীরে ধীরে নুরুদ্দীন সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে বললেন, "জান ভাই সাদত, ঐ মেয়েটির জন্যই আজ আমার প্রাণ বেঁচে গেছে, নইলে আমাকে আর ফিরে পেতে না।"—আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন নুরুদ্দীন রাবেয়াকে। বহুলোক দেখে সে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক জলপাই গাছের আড়ালে। সাদতআলী মুখ তুলে চাইলে সেদিক পানে, অবাক হয়ে গেল সে রাবেয়ার রূপ দেখে, জলপাই গাছের নীচে যেন গোলাপ ফুল ফুটে আছে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল সাদতআলি খানিকক্ষণ তারপর বললে, "কি অপরূপ রূপ লাবণ্য কিন্তু কে এ সুন্দরী?"

মৃদু হেসে শাহজাদা বললেন, "কোন খানদানি ঘরের মেয়ে নয় সাদত, সামান্য চাষীর ঘরে জন্মেছে ও, কিন্তু বলতে পার

দোস্ত একটা সাধারণ লোকের ঘরে এতরূপ এলো কি করে, আর এত মমতা ?"

সাদতালী বললো, "তা অমন হয় এক আধটা, কাঁটা বনে কি সুগন্ধী ফুল ফোটেনা—ঐরকম আর কি।"

কথাবার্ত্তাব মধ্যে সাদতালীর দৃষ্টি পড়লো নুরুদ্দীনের মাথার কাপড়ের উপর, কি ময়লা কাপড় বেঁধে দিয়েছে মেয়েটা



শাহজাদার মাথায় ; নাক সিট্‌কে সে বললে, "ঐ কাপড়টা ছেড়েদিন শাহাজাদা বড্ড ময়লা, আমার কাছে বেশ ভাল রুমাল আছে তাই দিয়ে বেঁধে দিই আপনার মাথা।" বাধা দিয়ে নুরুদ্দীন বললেন, 'তা হবার যো নেই দোস্ত, হেকিমের কড়া হুকুম আজ দিন রাতের ভেতর যেন এ বাঁধন খোলা না হয়। পরদিন খুললে আর কোন গোল থাকবে না।"

একটু হেসে সাদাতালি চাইলো গাছের নীচে রাবেয়ার

দিকপানে তারপর বললে, "বেশ তবে তাই হোক, হেকিম আর হাকিমের হুকুম তামিল না করে তো উপায় নেই। কাজেই আপনার ওটা থাক, কিন্তু আর ত' আপনাকে এভাবে রাখা চলে না, চলুন আমরা রাজধানীতে ফিরে যাই।"

"হাঁ দোস্ত, তাই করতে হবে, তবু একটু অপেক্ষা কর, মেয়েটাকে কিছু ইনাম দিয়ে যাই।" বলেই শাহজাদা এগিয়ে গেলেন সেই জলপাই গাছের নীচে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাবেয়া দেখছিল সব। শাহজাদা তার কাছে গিয়ে বললেন, "তোমারবাড়ি কোথায় রাবেয়া? কে কে আছে সেখানে?" খানিক দূরে দেখা যাচ্ছিল কয়েকটা খেজুর গাছ; তার নীচে খান দশ বার মাটির ঘর, ফুলের কলির মত আঙ্গুল তুলে রাবেয়া সেদিক দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ গাঁয়ে আমাদের বাড়ি, বাপ মা কেউ নেই, চাচার পরিবারে থাকি আর তাদের ফাই ফর-মায়েস খাটি, এই রকম করেই দিন কাটে আমার।" মেয়েটি তবে অনাথ! বেদনায় ভরে উঠলো শাহজাদার অন্তর, আঙ্গুল থেকে হীরের আংটিটা খুলে নিয়ে তিনি বললেন, "তুমি আজ আমার যে উপকার করেছ রাবেয়া কোন দাম দিয়ে তার পরিশোধ হয় না, তবুও এই সামান্য উপহারটুকু নিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর"

শাহজাদা নিজে ইনাম দিচ্ছেন—না নিলে তাঁর মনে আঘাত লাগবে, রাবেয়া দুহাত একত্র করে পাতলে তার সামনে।

হাত তুলে শাহজাদা বললেন, "না না এরকম নয়, এসো এটি আমি নিজেই পরিয়ে দিই তোমার আঙ্গুলে" বলেই নুরুদ্দীন পরম আদরে ধরলেন রাবেয়ার ডান হাতখানা। শিউরে উঠলো তার সারা অঙ্গ, থর থর করে কাঁপতে লাগলো হাতখানা-শাহ-জাদার মুঠোর ভেতর। আবেশে বুঁজে এলো তার ভোমরার মত কাল চোখ দুটি। ধীর শান্ত চিত্তে নুরুদ্দিন পরিয়ে দিলেন

আংটিটি রাবেয়ার গোলাপের কলির মত আঙুলে। ইনাম পেয়ে রাবেয়া কুর্ণীশ করলো শাহজাদাকে—তিনবার মাথা নুইয়ে। একটু হেসে নুরুদ্দীন বললেন, "বেশ বেশ, আমি তবে এখন আসি রাবেয়া, খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

এই কথায় রাবেয়ার চমক ভেঙ্গে গেল' এতক্ষন সে যেন আর আপনাতে আপনি ছিল না, কোন বেহেস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শাহজাদার কথা শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ—মাথা নুইয়ে তারপর ধরা গলায় বললে, "হাঁ যাবেন বৈকি, যেতে তো হবেই—" কথা আটকে গেল—রাবেয়ার দুগণ্ড বেয়ে পড়লো অশ্রু ধারা, রাবেয়া কাঁদছে। শাহজাদারও মনে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। কোন রকমে তিনি চেপে রেখেছিলেন নিজেকে, এখন রাবেয়ার চোখের জল দেখে তাঁরও চোখ ছল ছল করতে লাগলো। আচকানের হাতায় চোখ মুছে সহানুভূতির স্বরে নুরুদ্দীন বললেন, "ছিঃ কঁাদে না, ভাবনা কি, আমি আবার আসবো, এইখানে এই গাছের নীচেই আমাদের আবার দেখা হবে।" বলেই শাহজাদা সস্নেহে মুছে দিলেন রাবেয়ার চোখের জল—তাঁর আচকানের হাতা দিয়ে। তারপর ধীর পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ালেন সাদতআলীর কাছে। একটি সেপাই শাহজাদার ঘোড়াটা ধরে এনেছিল, সাদত অতি সন্তর্পনে শাহজাদাকে ঘোড়ার উপর উঠিয়ে বসিয়ে দিলে। তারপর সকলে ফিরে চললেন বনের সেই দিকে।

খানিক এগিয়ে শাহজাদা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন রাবেয়া ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছের নীচে, দৃষ্টি তার তাদের দিকে আবদ্ধ। বুকের ভেতরটা যেন তাঁর মোচড় দিয়ে উঠলো। মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলে নিলেন নুরুদ্দিন, তারপর মুখ ফিরিয়ে ঢুকে পড়লেন বনের ভেতর। যতক্ষণ দেখা যায় রাবেয়া ততক্ষণ সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দেখছিল শাহজাদাকে দু'চোখ ভরে—তারপর তিনি

আড়ালে চলে যেতেই তার চমক ভেঙ্গে গেল। তাইত', বেলা যে একেবারে পড়ে এসেছে, এখন ঘরে না ফিরলে চাচী আর রক্ষা রাখবে না। একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেড়িয়ে এলো তার বুকের ভেতর থেকে। তারপর ঘড়াটিতে জল ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে বাড়ির দিকে।

এদিকে সাদতালী দলবল সহ শাহজাদাকে নিয়ে গেল শিবিরে। সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক হোসেন সিরাজী এসে কুর্ণীশ করলে শাহজাদাকে, তারপর তাঁর অবস্থা দেখে চমকে উঠলো, "এ কি করে হলো মালেক? পোষাক পরিচ্ছদ যে একেবারে নোংরা হয়ে গেছে?"

নুরুদ্দীন বললেন, "ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে গিয়েছিলাম হোসেন, আমি আর এখানে বসব না, সোজা রাজধানীতে চলে যাচ্ছি, শিবির তুলে নিয়ে তুমিও চলে এসো।" হুকুম দিয়ে নুরুদ্দীন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিলেন রাজধানীর দিকে—পার্শ্বে সাদতআলী আর পেছনে সেই সিপাহীর দল।

তাঁরা বাদশাহী মহলে পৌঁছতেই বিষম হৈ চৈ পড়ে গেল—শাহজাদা ভারী চোট পেয়ে ফিরে এসেছেন শিকার থেকে। ছুটে এলেন প্রধান উজির সালামতআলী, এঁরই ছেলে সাদত। ছেলেকে সামনে পেয়ে উজির ধমকে উঠলেন, "কোনো একটা কাজও কি তোদের দিয়ে ভালভাবে করান সম্ভব হবেনা? শাহজাদা এরকম চোট পেলেন কি করে, তোরা ছিলি কোথায়? যত সব উজবুকের দল।"

মুখ কাঁচু মাঁচু করে সাদতআলি বললে, "কি করবো বাবা, একটা হরিণ দেখে শাহজাদা তার পিছু পিছু এত জোর তাড়া করলেন যে আমরা কিছুতেই তাঁর নাগাল ধরতে পারলাম না।"

পিতা পুত্রে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় সেখানে এসে

দাঁড়ালেন স্বয়ং সুলতান ফারুক শাহ্। ছেলের আপদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "কিরে, কি হয়েছে তোর! এইত দেখছি বেশ বসে আছিস ঘোড়ার উপর, তবে এত হৈ চৈ হচ্ছে কেন?"

কুর্ণীশ করে সাদতআলি বললে, "শাহজাদার মাথাতেই ভারী চোট লেগেছে জাঁহাপনা, আর তেমন কিছু হয় নি।"

হো হো করে হেসে উঠলেন সুলতান, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "তাই বল, আমি আরো ভাবলাম কি না কি হয়েছে। সুলতানার ভাবী মালিককে ওরকম একটু আধটুতে ঘাবড়ালে চলবে কেন, অনর্থক মহলে এরকম হৈ চৈ আমি মোটেই পছন্দ করি না। যাও তো সাদত, তুমি ওকে ওর মহলে নিয়ে, আমি এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি হেকিম সাহেবকে—ও কিছু না। দুদিনেই সব আসান হয়ে যাবে।"

সাদতআলীর কাঁধে ভর দিয়ে শাহজাদা চলে গেলেন তাঁর মহলে। কিছুক্ষণ পর সেখানে এলেন হেকিম দোস্ত মোহম্মদ খাঁ, শাহজাদাকে তিনি পরীক্ষা করলেন অতি সাবধানে, তারপর বললেন, "খোদা হাফেজ, ভয়ের কারণ নেই। যা কিছু চোট লেগেছে ঐ মাথায় আর পিঠে। আমি এখনই গিয়ে দাওয়াই পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার একটা খাবেন তিনবার দিনে রাতে, আর অন্যটা হচ্ছে তেল, ঐ তেলটা অল্প অল্প করে মালিশ করবেন পিঠে—যেখানটায় বেশী ব্যথা হয়েছে। মাথায় আর কিছু দিতে হবে না—যা দাওয়াই পড়েছে ওতেই হবে।"

হেকিম চলে গেলেন, তারপর নুরুদ্দীনের মা বেগম সাহেবা ঢুকলেন ঘরের ভেতর, চোখ দুটো তাঁর ছল ছল করছে, হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো! ছেলের পাশেই বসলেন তিনি সস্নেহে তাঁর বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কেমন আছ বাপজান, কোথাও জোর চোট লাগেনি তো?"

মৃদু হেসে শাহজাদা বললেন, "না আম্মাজান, তেমন কিছু চোট লাগেনি, তুমি ভেবো না, আমি শীগগিরই সেরে উঠবো।"

হাত জোর করে বেগম বললেন, "খোদা হাফেজ, তাই হোক্ বাপজান। খবর শুনে তো আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল আর কি!"



এই সময় ঔষধ নিয়ে ঘরে এলো খিদমতার জুম্মন, কুর্ণীশ করে সে ঔষধ দুটি রাখলো শাহজাদার বিছানার কাছে—তেপায়ার উপর। বেগম নিজের হাতে ছেলেকে ঔষধ খাইয়ে দিলেন। তারপর চললো মালিশ। বিছানার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জুম্মন মালিশ করছে শাহজাদার পিঠে, পাশে বসে দেখছেন বেগম তার কাজ; আর আস্তে আস্তে কথা বলছেন ছেলের সাথে।

কথায় কথায় বেগম বললেন, "এ কিরকম কাপড় দিয়ে মাথা বেঁধেছো বাপজান, বড্ড নোংরা। শিবিরে কি পরিষ্কার কাপড় ছিল না"

মৃদু হেসে নুরুদ্দীন বললেন, "আমার আম্মাজানের যেমন কথা, আমি কি শিবিরের কাছে চোট পেয়েছিলাম যে পরিষ্কার কাপড় এনে বাঁধবো ?"

বেগম বললেন, "ওঃ, সে যায়গা বুঝি শিবির থেকে অনেক দূরে! তা' কি করে এরকম হলো বাপজান ? তোমার সাথীরা ছিল কোথায় ?"

নুরুদ্দীন তখন সেই হরিণের পেছনে তাড়া করা থেকে একেবারে রাবেয়ার কথা পর্য্যন্ত আগা গোড়া সমস্ত প্রকাশ করে বললেন ; "সেই মেয়েটি যখন ওটা খুলতে নিষেধ করেছে আম্মাজান, তখন তার কথাই রাখা উচিত, নইলে খারাপ হতে পারে।"

চোখ দুটো বুজে শিউরে উঠলেন বেগম, "থাক্ থাক্ বাপজান, ও তবে আর খোলবার দরকার নেই, তুমি আগে সেরে ওঠ, তাহলেই আমার সব আছে।" এই সময় খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো খানসামা আব্বাস, বেগম ছেলেকে খাইয়ে দিয়ে চলে গেলেন। মা চলে যাবার পর নুরুদ্দীন শুয়ে পড়লেন বিছানায়, মালিশে কিছু কাজ হয়েছে, চোখ বুজে তিনি ভাবতে লাগলেন রাবেয়ার কথা। ফুলের মত সুন্দর আর মমতায় পরিপূর্ণ অন্তর-খানি তার। একধারে এমন রূপ আর গুণ বড় একটা দেখা যায় না। বিদায়ের সময় সে কেমন করে একদৃষ্টে চেয়েছিলো তাঁর দিকে! সে চাউনি ভুলবার নয়—গাঁথা রয়ে গেছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। প্রেমের কি বিচিত্র খেলা! একদিনের দেখা, তাতেই এমন হয়ে গেল! রাবেয়াকে না পেলে তাঁর প্রাণ বাঁচবে না।

কিন্তু রাবেয়া কি তাকে ভালো বেসেছে ? নিশ্চয় বেসেছে, তা নইলে আংটি পরাবার সময় আবেশে সে চোখ বুজে ছিল কেন ? বিদায়ের সময় অমন করে কেঁদেছিল কেন ?—আর সেই গোলাপী গণ্ডের অশ্রু-মুক্তা তো তিনিই নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়েছিলেন ভাবতে ভাবতে শাহজাদা ঘুমিয়ে পড়লেন।



এদিকে রাবেয়া জল নিয়ে বাড়ীর উঠোনে পা দিতেই চাচী উঠলো ঝঙ্কার দিয়ে, "কোথায় ছিলি হতভাগী এতক্ষন ? ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রইল আর তিনি গিয়ে বসে রইলেন জলের ধারে। কি করছিলি এতক্ষণ বল,- নইলে তোরই একদিন আর আমারই একদিন।"

ঘড়াটা মাটিতে রেখে রাবেয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো

মাথা নীচু করে। দেখেই চাচী চেঁচিয়ে উঠলো, "ঘড়াটা রেখে বড় যে চুপ করে রইলি? কাজ কর্ম্ম কি হবে না?"

রাবেয়া ধীরে ধীরে বললে, "আমি কি বলেছি যে কাজ করবো না।"

"কি—আমার কথার উপর কথা, আজ তোকে মেরে হার গুঁড়িয়ে দেব।" তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো চাচী একেবারে মারমুখো হয়ে। এমন সময় বাড়ীর ভেতর ঢুকলো এসে রাবেয়ার চাচা, উমর আলী; হাতে তার এক বোঝা শুকনো খেজুর গাছের ডাল। বোঝাটা নামিয়ে রেখে উমর আলী বললে, "হঠাৎ এরকম ক্ষেপে উঠলে কেন বিবি, কি হয়েছে?"

হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু, সেই কখন গিয়েছিলেন জল আনতে আর বেলা শেষ করে এই এখন এসে ঢুকলেন বাড়ীতে. এরকম করলে চলবে কেন নবাবের বেটী আবার বলেন, "আমি কি কাজ করবো না বলেছি?"

মাঝখানে বাধা দিয়ে ওমর আলি বললেন, "কে, রাবেয়ার কথা বলছো?"

"হাঁ গো হাঁ, তোমার সেই নবাব বেটীর কথাই বলছি। রূপের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—দুনিয়াকে গ্রাহ্যই করে না। এরকম হলে আমি আর সামলাতে পারব না কিন্তু সাফ বলে দিচ্ছি" দুম্ দুম্ পা ফেলে চাচী ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

"কি হয়েছিল রে রাবেয়া? এত দেরী করলি কেন?" ধীরে ধীরে উমর আলী গিয়ে দাঁড়ালেন রাবেয়ার কাছে।

রাবেয়া তখন সেই শাহাজাদা কাহিনী আগা গোড়া চাচার নিকট প্রকাশ করে বললে, "এই কারণেই আজ একটু দেরী হয়ে গেল চাচাজী, নইলে রোজ ত' তাড়াতাড়িই চলে আসি।"

ঘটনা শুনে উমর আলি ত' ভারী খুশী, সস্নেহে রাবেয়ার পিঠে দুবার হাত বুলিয়ে সে বললেন, "খুব ভালো কাজ করেছিস রাবেয়া খোদা তোর ভাল করবেন, দেখবি কালই হয়ত সুলতানের খেলাত এসে হাজির হবে তোর কাছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বরাত ফিরে যাবে রে বেটী। এ কষ্ট আর থাকবে না। যা এখন জল রেখে কি সব কাজ টাজ সেরে ফেল, নইলে দেখছিস ত' পাড়া গরম হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।"

জলভরা ঘড়া নিয়ে চলে গেল রাবেয়া। উমর আলী বোঝাটা ঘরের দাওয়ায় রেখে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নিলে, তারপর হুকো কলকে নিয়ে বসলো দাওয়ার উপর। আরামে তামাক টানতে লাগলো সে মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে।

তামাক টানতে টানতে তার চোখ দুটো আপনা আপনি বুজে এল নেশার আমেজে চোখ বুজে বসে উমর আলী ভারতে লাগলো এতদিন পর খোদা বোধ হয় চোখ তুলে চাইলেন—নইলে ওরকম ঘটনা ঘটবে কেন। আজ হোক কাল হোক সুলতানের খেলাত আসবেই একদিন, আর তা' বেশ মোটা রকমেরই একটা কিছু হবে। তারপর শাহাজাদার অনুগ্রহে চাই কি তার নিজেরও একটা কাজকর্ম্ম হয়ে যেতে পারে ; তাহলে আর তাকে পায় কে। কিছুতেই সে আর এই পাড়াগাঁয়ে মাটির ঘরে থাকবে না—রাজধানীর মধ্যেই একখানি ছোট পাকা বাড়ি করে সেখানে চলে যাবে। ভারতে ভাবতে উমর আলী ঘুমিয়ে পড়লো— দেয়ালে হেলান দিয়ে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে—যেন সুলতানের দরবারে হাজির হয়েছে আর সুলতান তাকে বহুমূল্য খেলাত দিয়ে তাঁর ওমরাহের পদে নিযুক্ত করেছেন। সহরের ভেতর মস্ত বাড়ি তৈয়ারী করে তারা উঠে গেছে সেখানে। দাসদাসী লোকজন গিজ্ গিজ্ করছে তার বাড়িতে। দরবারী পোষাক পরে সে যাচ্ছে

দরবারে, আবার দরবার শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসছে ঘোড়ায় চড়ে। বাড়ির সামনেই এসে দেখে বহুলোকর ভিড় লেগে গেছে সেখানে, তাকে দেখেই লোকগুলো রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। এক বাজীকর ভেল্কীবাজি দেখাচ্ছে, যাদুর কাঠি হাতে নিয়ে সে বলে উঠলো—"এখন জনাবকে আমার সবচেয়ে সেরা খেলা দেখাব—মেহেরবানি করে দেখুন।" বলতে বলতে যাদুকর তার কাঠিখানা ঘোরাতে লাগলো উমর আলির সামনে, সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর গান আর রাবাবের ধ্বনিতে চারদিক ভরে উঠলো, দেখতে দেখতে একদল অপরূপ সুন্দরী এসে ঘিরে দাঁড়ালো তার চারদিকে, নাচতে লাগলো তারা গান বাজনার তালে তালে। মুগ্ধ হয়ে গেল উমর আলী, ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো সে নর্ত্তকীদের পানে চেয়ে। মুহূর্ত্তে তারা কোথায় মিলিয়ে গেল সে বুঝতে পারলো না, চমক ভেঙ্গে উমর আলী দেখলো নর্ত্তকীরা কোথায় মিলিয়ে গেছে—তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেই যাদুকর, একমুখ গোঁফদাঁড়ি নিয়ে সে হাসছে আর কাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে, "সব ফাঁকি সব ফাঁকি—আজব যাদুর খেল, দেখতে গেল, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি—"

"ওকি হচ্ছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছো যে, নেশা করতে সুরু করছে নাকি?" ঝাঁজিয়ে উঠলো চাচী। ধমক খেয়ে উমর আলির ঘুম ভেঙ্গে গেল, দুহাতে চোখ রগড়ে সে সোজা হয়ে বললো, "কিছু বলছো নাকি?"

চাচী বললো, "বলবো আবার কি, নেশা-টেশা ধরছো নাকি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছিলে যে বড়?"

উমর আলি বললো, "সে অবস্থা কোথায় যে নেশা করবো? আর হাসির কথা জানতে চাও? ও আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম—সুলতানের দরবারে ওমরাহ হয়েছি আর বাড়ি ভর্তি

দাসদাসী—" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে চাচী বললো, "হয়েছে, হয়েছে—আশমানে আর সোনার মহল তৈয়ার করতে হবে না, যত সব বাজে চিন্তা করে মাথা খারাপ করছো। ওসব কি কখনো সত্যি হয়? সব ফাঁকি—।" "ও বাবা এও যে সেই একই কথা বলে, সব ফাঁকি"—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো উমর আলী, তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লো ঘরের মেজেয়—বিছানা পেতে।

পরদিন ভোরে নুরুদ্দীনের ঘুম ভাঙ্গলে শরীরটা তার কিছু হাল্কা হয়েছে—মাথার বেদনা এক রকম নাই বললেই হয়। আস্তে আস্তে তিনি মাথার বাঁধন খুলে ফেললেন। কাটা জায়গাটার উপর রাবেয়ার লাগান ঔষধ এঁটে বসেছে—শক্ত হয়ে। মহলের সকলে তখন জেগে উঠেছে। এখনি মা এসে বলবেন—ওটা ফেলে দে, বড্ড নোংরা; কিন্তু তার কাছে ত, এ জিনিষ নোংরা হতে পারে না। এ তাঁর রাবেয়ার প্রেমের চিহ্ন। এটাকে রাখতেই হবে—যে প্রকারে হোক। কিছুক্ষণ ভেবে নুরুদ্দীন করলেন কি কাপড়-খানা ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখলেন বিছানার জাজিমের নীচে। ঠিক সেই সময় বেগম এসে দেখলেন ছেলে অনেকটা ভাল আছে। পাশে বসে তিনি সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন ছেলের গায়ে।

ক্রমে নুরুদ্দীন সেরে উঠলেন বেশ ভাল হয়ে, কিন্তু রাবেয়ার চিন্তা তাঁকে একেবারে পেয়ে বসলো। তিনিও তাকে কথা দিয়েছেন, আবার গিয়ে দেখা করবেন তার সাথে। এদিকে রাবেয়া রোজ জল আনতে যায় সেই ঝরণায়, ঘড়ায় জল ভর্ত্তি করে এসে দাঁড়ায় সেই জলপাই গাছের নীচে, শাহজাদাও বলে গেছেন এখানেই আবার তাদের দুজনে দেখা হবে। কিন্তু শাহজাদা আসেন না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাবেয়া ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

এইভাবে দিন যায়, একদিন রাবেয়া রোজকার মত অপেক্ষা করে ফিরে চলেছে বাড়ির দিকে, এমন সময় পিছন থেকে শব্দ হল, "দাঁড়াও রাবেয়া, আমি এসেছি।" কি মন মাতান কণ্ঠ! —রাবেয়ার শরীর পুলকে কাঁটা দিয়ে উঠলো, পা ছুখানা আর চলতে, চায় না,—ফিরে তাকালো রাবেয়া। মৃদু হেসে শাহজাদা এসে দাঁড়ালেন রাবেয়ার কাছে—একেবারে তার গা ঘেঁসে। তারপর তার ডান হাতখানা সস্নেহে ধরে বললেন, "রাবেয়া আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছি। আর এ কেবল তোমারই দৌলতে। তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে আমি আর আসব না। কিন্তু তা কি হয় রাবেয়া? আমি যে তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারব না।"

শাহজাদার কথাগুলো রাবেয়ার কানে যেন অমৃত ঢেলে দিচ্ছিল বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। চোখের কোণে দেখা দিল ছুফোঁটা অশ্রু। ধরা গলায় সে বললে, আমার জীবন ধন্য কিন্তু আমি সামান্য চাষীর মেয়ে, এত সুখ কি সহ্য হবে?"

নুরুদ্দীন বললেন, হবে রাবেয়া হবে, অনেক ভেবেও তোমাকে সরাতে পারলাম না হৃদয় থেকে, তোমাকে ছেড়ে আমি বেহেস্তেও যেতে চাই না—বাদশাহী ত তুচ্ছ।"

আবেশে রাবেয়ার চোখ ছুটো বুঁজে এলো কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "আমার মত একটা অনাথার প্রতি শাহজাদার এত মেহেরবানি—এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে, কিন্তু মহামান্য সুলতান কি তাতে রাজী হবেন?"

নুরুদ্দীন বললেন, "সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না রাবেয়া। বাবা যদি এতে বাধা দেন আমি তাঁর কথা মানব না; এতে সুলতানী তখ্‌তও যদি ছাড়তে হয় ছেড়ে দেব কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারব না।"

এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে শাহজাদা আবার ঘোড়ায় চড়ে চলে

গেলেন। রাবেয়া একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তাঁর চলার পথের দিকে। তারপর তিনি চোখের আড়াল হতেই ধীরে ধীরে পা বাড়ালো বাড়ির পথে।

এইভাবে নুরুদ্দীন প্রায়ই এসে দেখা করেন রাবেবার সাথে —সেই জলপাই গাছের নীচে। দুজনের মধ্যে ভালবাসা ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠে। এ কথা টের পেল সাদত আলি। শাহজাদার ভবিষ্যৎ ভেবে তার বড় কষ্ট হলো। একদিন নিরিবিলি সে শাহজাদাকে ডেকে নিয়ে বললে,"শাহজাদা, আপনার এ কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হচ্ছে না, এখনো সাবধান হোন।"

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে নুরুদ্দীন বললেন, "কোন্ কাজটা সাদত ? কি এমন কাজ করছি যার জন্য এমন সাবধান করে দিচ্ছ ?"

সাদত আলি বললে, "ঐ চাষার মেয়েটার কথা বলছিলাম শাহজাদা, ওর সঙ্গে এত ঘন মেলা-মেশা করা উচিত নয়।"

নুরুদ্দীন বললেন, "ও, রাবেয়ার কথা বলছো, কেন তার সঙ্গে মেলা মেশা করলে খারাপটা কি হয় শুনি ? সে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তার ঋণ আমি কিছুতেই শোধ করতে পারব না। তাছাড়া আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি মনে প্রাণে, এমতাবস্থায় মেলা-মেশাটা খারাপ বলে ধরে নিলে কেন বলত'।"

সাদত আলি বললে, "সবই বুঝি শাহজাদা, আমিত' আপনারই সমবয়সী আর সঙ্গী কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে যদি সুলতানের কানে এ কথা উঠে তবে কি হবে।"

দৃঢ়কণ্ঠে শাহজাদা বলেলেন, "তবে শোন সাদত, আমি স্থির করেছি রাবেয়াকে বিবাহ করে আমার সহধর্ম্মিনী করবো। ওকে ছেড়ে আমি কিছুতে বাঁচতে পারবো না, কোন বাধাই আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।"

সাদত আলি বললে, "গোলমাল ত' ঐখানেই, সুলতানের বংশ-মর্য্যাদার দিকে যে রকম কড়া নজর তাতে করে তিনি যে আপনার কথায় রাজী হবেন এ মনে হয় না। হাঁ তবে যদি বিয়ে না করে এমনি রাবেয়াকে নিয়ে রাখেন আপনার হারেমে—তাতে হয়তো তিনি রাজী হতে পারেন।"

ঘৃণাভরে নুরুদ্দান বললেন, "তুমি বলছো কি সাদত ? মনে-প্রাণে যাকে ভালবেসেছি তাকে বিয়ে না করে শুধু রূপ যৌবন ভোগ করবার জন্য হারামে নিয়ে রাখবো, খোদার কাছে প্রার্থনা জানাই এতবড় শয়তানী বুদ্ধি যেন আমার কোনকালেও না হয়।"

সাদত আলি বললে, "কিন্তু তাহলে যে আপনাকে তখ্‌তের আশাও ছাড়তে হয়, রাবেয়াকে বিয়ে করলে সুলতান আপনাকে কিছুতেই তখ্‌তে বসতে দেবেন না। সেদিকে খেয়াল আছে ?"

'খুব খেয়াল আছে সাদত, আঙ্কারার তখ্‌ত তো দূরের কথা রাবেয়ার ভালবাসার কাছে আমি সারাদুনিয়ার বাদশাহীও তুচ্ছ মনে করি।" আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে এর বদল হতে পারে না। দুহাতে সাদত আলীর কাঁধ দুখানি ধরে তাকালেন শাহজাদা তার চোখ দুটির উপর। শাহজাদার চোখে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সাদত আলী, এতবড় একটা রাজ্যের ভাবি মালিক আজ পথের ফকির হতে দ্বিধা করছেন না শুধু প্রেমের জন্য। ধন্য সেই চাষার মেয়ে রাবেয়া যার প্রেমের দায়ে আজ আঙ্কারার শাহজাদা দেওয়ানা হতে চলেছেন। অজান্তে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো সাদতের চোখ বেয়ে। আবেগ ভরে শাহজাদা জড়িয়ে ধরলেন সাদতআলিকে বুকের মধ্যে, গদগদ কণ্ঠে বললেন, "এতক্ষণে এসে বুঝতে পেরেছ দোস্ত্‌, আমার মনের অবস্থা। প্রকৃত প্রেম মানুষকে এমনি করে দেয়, এতে উঁচু-নীচু ভেদ থাকে না মোটেই।"

ধরা গলায় সাদত আলি বললে, "আমিতো ছেলেবেলা থেকে আপনার সাথেই আছি শাহজাদা, একটা নাড়ীর টান হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে; তাই বাধা দিতেও সাহস করছি না কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে মনকেও প্রবোধ দিতে পারছি না।"

শাহজাদা তখন তাকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন তারপর এই ঘটনা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সেই বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ঘটনা চাপা রইলো না। সুলতান এই কথা শুনে একেবারে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন, কি এতবড় হীন মনোবৃত্তি তাঁর ছেলের, যে মহাবীর সালাদিনের বংশধর হয়ে চায় একটা সামান্য চাষার মেয়েকে বিবাহ করতে! দুনিয়ার সুলতান, আমির আর বাদশাহদের ঘরে কি মেয়ে নাই যে সে অমন করে হীন ঘরে বিবাহ করতে চাইছে! কিন্তু তা হবে না, চাষার মেয়ে আস্কারার বেগম হতে পারবে না, কিছুতেই না।

পরদিন ভোরেই সুলতান শাহজাদাকে ডেকে এনে বললেন, "শোন নুরুদ্দীন, আমি সবই জানতে পেরেছি। কিন্তু এ হয় না—এত বড় পবিত্র বংশধারায় চাষার রক্ত মিশতে পারে না কিছুতেই। দুনিয়ার কি সুলতানের বাদশাহের মেয়ে নেই যে তুমি চাইছো একটা নগণ্য চাষার মেয়েকে বিয়ে করতে? আমি থাকতে তা' হতে পারে না। তোমাকে সাত দিন সময় দিলাম —এর মধ্যে মনস্থির করে আমাকে জানাবে—কি করবে না করবে—এখন যাও—"।

শাহাজাদা চুপ করে সব শুনলেন—তারপর মাথা নত করে চলে গেলেন—পিতার কাছ থেকে। পিতাকে তিনি জানেন যা, একবার ধরে বসবেন তার ব্যতিক্রম হবে না কিছুতেই। কিন্তু তিনিও তো তাঁরই ছেলে, তাঁর মধ্যেও পিতার রক্তধারা বইছে; কাজেই স্বভাবও সেই রকমই হয়েছে। রাবেয়াকে যে তিনি

কথা দিয়েছেন—বিয়ে করবেন বলে, আর এখন সে কথার খেলাপ করবেন কি করে ? শিশুর মত সরলা বালিকা রাবেয়া, সে ত তার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আছে। না, এ হতে পারেনা— তিনি কথা রাখবেনই—এতে যা হোক। অনেক ভেবে চিন্তে নুরুদ্দীন স্থির করলেন যে তিনি রাবেয়াকেই বিবাহ করবেন— অন্য কেউ তাঁর হৃদয়ে স্থান পাবে না।

এদিকে ছেলেকে সাবধান করে দিয়ে সুলতান গেলেন বেগমের কাছে সমস্ত কথা শুনে বেগম চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ—তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, "তাহলে আপনার ইচ্ছা কি ? ছেলে যদি কথা না শুনে তবে কি করবেন ?"

সুলতান বললেন "কি করবো শুনতে চাও ? তাকে আমি আমার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবো—ওর বদলে তখ্‌তে বসবে ছোট ছেলে সামসুদ্দীন।"

ভীত হয়ে বেগম বললেন, "নুরুদ্দীন তাহলে কি করবে, আপনার ছেলে হয়েও কি সে ফকিরের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে ?"

সুলতান বললেন, "তাই এই করেই ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম কিন্তু তা' আমি হতে দেবনা। ও বাইরে থাকলে শেষে হয়তো সামসুদ্দীনের সঙ্গে শত্রুতা করে বিষম অনর্থ বাধাবে—সেইজন্য আমি স্থির করেছি যে ও যদি আমার কথা না শুনে, তবে ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আঙ্কারার তখ্‌ত নিষ্কণ্টক করবো।"

এই কথায় বেগম চমকে উঠলেন, ভয়ে তাঁর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। জোড়হাতি তিনি সুলতানকে বললেন, "জাঁহাপনা, দীন দুনিয়ার মালিক, পিতা হয়ে পুত্রকে এমন গুরুদণ্ড দেবেন না—এই আমার আরজ।"

হাত তুলে সুলতান বললেন, "তা হয়না বেগম, সাধারণ

গেরস্ত ঘর হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এ সুলতান পরিবার। এর সঙ্গে সমস্ত দেশের ভাগ্য জড়িত—কাজেই এতে অন্যথা হতে পারে না। আচ্ছা, বল দেখি তুমি হলে সমরখন্দের শাহজাদী। তোমাকে প্রজারা কি রকম সম্মান করে, এর পর



যদি সেই চাষী মেয়েটা এসে বসে এই জায়গায়—তখন প্রজারা করবে কি? তারা কি তাকে এই রকম সম্মান দেখাতে পারবে? তারপর দেখ, যে ছেলে স্ত্রীলোকের জন্য এত মেতে উঠে যে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তাকে তখ্‌তে বসানোও বিপদজনক।

ওরকম লোক দিয়ে দুনিয়ার কোন কাজ হয় না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই আমি যা স্থির করেছি তাই হবে—এ জেনে রেখো।”

অনুনয় করে বেগম বললে, “শাহান শাহ, দীন দুনিয়ার মালিক, যা ইচ্ছা করবেন তাই হবে; তবে আমার একটি আরজ—আমি তাকে একটু বোঝাতে চাই, এতেও যদি সে কথা না শুনে তবে আপনার যা অভিরুচি তাই করবেন।”

“খুব ভাল কথা, তুমি তার মা, তুমি গিয়ে বোঝালে ভালই হয়। দেখ যদি ফেরাতে পার তাকে—আমার আপত্তি নেই।” এই কথা বলে সুলতান চলে গেলেন বাহির মহলের দিকে আর বেগম চললেন ছেলের মহলে।

ছেলের ঘরে গিয়ে বেগম দেখলেন নুরুদ্দীন চুপ করে বসে ভাবছেন। চোখে মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। ধীর পদক্ষেপে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাকে দেখে নুরুদ্দীন বললেন, “তুমিও তাহলে সব শুনেছো মা।”

বেগম বললেন, “হাঁ বাপজান, সবই শুনেছি। তোমার এ রকম মনোবৃত্তি হলো কেন বলত? দেশ বিদেশের আমির সুলতানের ঘরে কি সুন্দরী মেয়ে নেই যে তুমি একটা নগণ্য চাষার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছো? শুধু তার রূপ-লাবণ্যের জন্য—”

বাধা দিয়ে নুরুদ্দীন বললেন, ‘তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মা। আমি তার রূপ-লাবণ্যে ভুলিনি মোটেই। সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাই তাকে বিয়ে করে সেই ঋণ অন্ততঃ কিছুটা শোধ করতে চাই। তারপর তুমি ত' তাকে দেখনি মা? ওরকম গুণবতী মেয়ে হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ।”

বেগম বললেন, ‘সবই ত' বুঝলাম বাপজান, কিন্তু সুলতান যে এতে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাঁর গোঁ যে কি রকম তা

ত' জান। সোজা ডুবে যাবেন কিন্তু মাথা নত করবেন না। কাজেই ঐ জিদ ছেড়ে দাও বাপজান। আমি শীঘ্রই তোমার জন্য বাদশাহের মেয়ে নিয়ে আসছি।"

নুরুদ্দীন বললেন, "তা হয়না মা। আমি তাকে কথা দিয়েছি। আস্কারার শাহজাদা কখনো কথার খেলাপ করবে না—এতে যা হয় হোক।"

স্তব্ধ হয়ে রইলেন বেগম কিছুক্ষণ, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কপালে যার দুঃখ আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারে না। বাপজান, তুমি তো দুঃখ পাবেই আমাকেও সারা-জীবন জ্বলে মরতে হবে। কারণ, আমি শুনেছি সুলতানের কথা না রাখলে তিনি তোমাকে কিছুতেই তখ্‌তে বসতে দেবেন না—উপরন্তু তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত যেতে পারে। জানতো তাঁকে—তাঁর যা কথা সেই কাজ।"

"যা হয় হবে। মা, আমি কথার খেলাপ করবো না কিছুতেই।"—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাদা। ছেলের ভাব দেখে বেগম ভারী চিন্তায় পড়লেন। যেমন পিতা তেমন পুত্র! সমান জেদী দুজনেই। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বললেন, "শোন বাপজান, যদি একথা সুলতানের কানে যায় তবে তোমার প্রাণ বাঁচান দায় হবে। তাই বলছি তুমি পালিয়ে যাও এখান থেকে—রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তবু আমি জানবো যে আমার ছেলে বেঁচে আছে। এতে আমার মনের বেদনা কতক শান্ত হবে। এখানে থাকলে আমি কিছুতেই তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না।"

মায়ের পরামর্শে নুরুদ্দীন পরদিন রাত্রে মহল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন—সাধারণ লোকের ছদ্মবেশ ধরে। ছেলে পলায়ন করেছে শুনে সুলতান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলে,

তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "যাক, আপদ বিদায় হয়েছে। শামসুদ্দীনকেই আমার উত্তরাধিকারী স্থির করলাম। আমার পরে সে বসবে আঙ্কারার তখ্‌তে।" চারিদিকে রটে গেল নুরুদ্দীনের পলায়ন সংবাদ। শুনে ত চাচী রেগেই আগুন। হাত মুখ নেড়ে উমর আলীর সামনে গিয়ে বললে, "কেমন হয়েছে তো, সুলতান তোমাকে একেবারে বাদশাহী দিয়ে দিয়েছেন! আমি ত' জানি ওসব ফাঁকি, সব বাজে। কি না ভায়ের মেয়ে শাহজাদার নজরে পড়েছে! আর ভাবনা কি, আমির হয়ে যাব, দাসী বাঁদীতে মহল গম গম করবে—দূর-দূর ঐ অপয়া ছুঁড়িকে আমি আর একদিনও বাড়িতে ঠাঁই দেব না—এতে তুমি রাগ কর আর যাই কর, আমি শুনবো না।" চেঁচিয়ে অভিসম্পাত দিতে লাগলো চাচী রাবেয়াকে।

স্ত্রীর কথায় উমর আলীর মনে বড়ই আঘাত লাগলো। তাইত', সে যে স্বপ্নে দেখেছিল, বাজিকর বলছে 'সব ফাঁকি'—তা' তবে সত্যিই হলো? দুঃখ আর তার ঘুচলোনা! চুপ করে বসে রইল সে দাওয়ার একপাশে। এদিকে চাচীর স্বর ক্রমেই সপ্তমে চড়ে উঠলো। পাড়ার সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে রাবেয়ার বাপান্ত করতে লাগলো। কত আর সহ্য করা যায়! তার জন্য অতবড় রাজ্যের ভাবী মালীক পথে বাহির হয়ে পড়েছেন। তার ওপর চাচীর এই অত্যাচার—ভেবে চিন্তে রাবেয়া করলো কি গভীর রাত্রে সেও বাড়ি-ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লো অজানার পথে।

সারা রাত্রি চলে তার পাঁয়ে ব্যথা হয়ে গেল—তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ; আর চলতে পারে না রাবেয়া। সামনেই পড়লো একটা খেজুর গাছ। তার গোরায় হেলান দিয়ে সে বসে পড়লো সেখানে,—সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানেনা, হঠাৎ হৈ-হল্লা শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলেই তার

চক্ষুস্থির। সামনেই ঘোড় ছুটিয়ে আসছে একদল সওয়ার—হাতে তাদের তলোয়ার আর বল্লম। রাত ভোর হয়ে তখন বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। ঘোড়সওয়ারেরা এসে তাকে ঘিরে ফেললে। ভয়ে কাঁপতে লাগলো রাবেয়া—মুখে কথা সরলো



না। দলের সর্দ্দার বললে, "বাহবা! বাহবা! খোদা কি মেহেরবান! কাজে বের হয়েই এমন একটা বেহেস্তের হুরী পেয়ে গেলাম—আজ দিনটা বেশ ভালই যাবে দেখছি।" সর্দ্দারের কথায় সকলে হেসে উঠলো, "মারহাব্বা! সর্দ্দার সত্যিই বলেছেন, একে নিয়ে যাওয়া যাক্—সর্দ্দারের খেদমত করবে আরামের সময়।"

সর্দ্দার বললে, "আমার খেদমতের দরকার নেই। বন্ধুগণ

একে নিয়ে আমরা বসরার হাটে বিক্রয় করবো, বেশ মোটা দাও মারা যাবে একে দিয়ে !"

তাই হলো, সর্দ্দার তাকে নিয়ে গেল বসরার হাটে। রাবেয়ার রূপ দেখে হাটের সকলের ত' চক্ষুস্থির ; বড় বড় ধনী সওদাগর এসে দাঁড়ালেন তাকে কিনবার জন্যে, সর্দ্দার এতো চড়া দাম হাঁকলো যে তারা সকলেই ফিরে গেলেন মুখ চূণ করে। বসরার বিধবা বেগম আয়েষার লোক এসেছিল সেই হাটে, সেই মূল্য দিয়ে রাবেয়াকে কিনে নিয়ে গেল—বেগমের জন্য, রাবেয়াকে দেখে বেগম তো খুব খুসী ! তিনি তাকে তাঁর খাস কামরার বাঁদী করে রাখলেন নিজের কাছে।

এদিকে নুরুদ্দীন মহল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গোপনে দেখা করলেন—সাদত আলির সাথে। তাঁর অবস্থা দেখে সাদত বালকের মত কেঁদে উঠলো। শাহজাদা তাকে থামিয়ে বললেন, "এরকম করলে ত' আমাকে বাঁচাতে পারবে না দোস্ত, আমি তোমার এখানে দুদিন লুকিয়ে থাকতে চাই। আশা করি এতে আপত্তি হবে না।"

ধরা গলায় সাদত আলি বললে, "শাহজাদা, এবাড়ি আপনার। যতদিন ইচ্ছা থাকুন, কেউ টেরও পাবেনা।"

সাদতের কথায় শাহজাদা সেখানে রয়ে গেলেন গুপ্তভাবে। দুদিন কেটে গেল এইভাবে, তিনদিনের দিন শাহজাদার কথায় সাদত আলি গেল রাবেয়ার খোঁজে—ছদ্মবেশে। তার আগের দিন রাত্রে সে চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে। সাদত আলি এসে বললে, "শাহজাদা, রাবেয়া কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারে না। আপনি ওর আশা ছেড়ে দিন—বাড়ি ফিরে যান।"

বিষাদমাখা হাসি হেসে নুরুদ্দীন বললেন, "হা দোস্ত, যাব তবে বাড়িতে নয়। আমার জন্য যে পথে বেরিয়েছে তারই খোঁজে।

যাব দেশ থেকে দেশান্তরে, যদি তার দেখা পাই তবেই আমার ভ্রমন বন্ধ হবে ; নইলে যতদিন বাঁচবো চলার শেষ হবেনা। দেওয়ানা হয়ে বেড়াব পথে পথে।"

সাদত আলি বহু অনুনয় বিনয় করলো—তাঁকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু নুরুদ্দীন কিছুই শুনলেন না। গভীর রাত্রে সাদত আলির কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—অজানার পথে। সারারাত্রি পথ চলে ভোর বেলা তিনি এসে থামলেন এক পাহাড়ের নীচে। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। সামনে সুন্দর একটি ঝরণা দেখতে পেয়ে পেটভরে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন। তারপর একগাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বসে বসে তিনি ভাবতে লাগলেন—কোন দিক দিয়ে কোথায় যাবেন—এমন সময় কয়েকজন লোক কথাবার্ত্তা বলতে বলতে সেখানে এসে দাঁড়ালো। দূরে মাঠের শেষে দেখা যাচ্ছিল ছোট্ট কয়েকটি গ্রাম। লোকগুলো যাচ্ছে সেখানে।

গাছের নীচে অপরিচিত অপরূপ সুন্দর শাহজাদাকে দেখে তারা থমকে দাঁড়ালো সেখানে। তারপর কাছে এসে বললে, "তোমাকে দেখতে বিদেশী বলে মনে হচ্ছে—কেমন না?"

শাহজাদা বললেন, "হাঁ, আমি বিদেশী ভ্রমণকারী। দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পরেছি। আপনারা যাবেন কোথায়?

হাত তুলে সেই গ্রামের দিক দেখিয়ে তাদের একজন বললে, "আমরা যাচ্ছি ঐ গ্রামে। ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলাম এক কুটুম্বের বাড়ি। তোমাকে দেখে ভারি পরিশ্রান্ত আর ক্ষুধার্ত্ত বলে মনে হচ্ছে—চলনা আমাদের ওখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করবে?" লোকটির কথায় শাহজাদা গেলেন তাদের গ্রামে।

গ্রামের লোক ত' তাঁকে দেখে অবাক। এ নিশ্চয় কোন বড় ঘরের ছেলে—নইলে এমন রূপ হয়—বলাবলি করতে লাগলো তারা। গ্রামের লোক তাঁকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলে। কয়েকদিন সেখানে বিশ্রাম করে শাহজাদা আবার বেরিয়ে পরলেন সমুদ্রের ধার ধরে। এবার তাঁর চলার পথে বেশ ঘন ঘন লেকালয় পড়তে লাগলো। চলতে চলতে তিনি সেই সব জায়গার খবর করতে লাগলেন যে তারা রাবেয়া নামে কোন সুন্দরী মেয়েকে সেদিক দিয়ে যেতে দেখেছে কি না। কিন্তু তারা বললে এরকম কাউকে তাদের এদিকে কেউ দেখে নাই।

এইভাবে চলতে চলতে শাহজাদা ইরাক সীমান্তে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক বাড়িতে অতিথি হয়ে রইলেন দু তিন দিন কথায় কথায় একদিন বাড়ির মালিক তাঁকে বললে, "দেখ বাপজান, তুমি একা একা আর এরকম ঘুরে বেড়িও না। এদিকের পথ-ঘাট মোটেই ভাল নয়। দুরন্ত বেদুইনেরা ঘুরে বেড়ায় শিকারের খোঁজে চারিদিকে।"

শাহজাদা বললেন, "আমিত পথের ফকির। সাহেব, আমার কাছে তারা কি পাবে যে আমাকে আক্রমন করবে ?"

মালিক বললে, "ধন দৌলত না থাকলেও কি হয়রে বাপ—রূপ ত' আছে। তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বিক্রীর হাটে বিক্রী করবে চড়া দামে। তখন আর বেরোবার পথ পাবে না।"

শাহজাদা বললেন "বলেন কি ! এদিকেও ঐ উৎপাত সুরু হয়েছে নাকি ?"

মালিক বললে, "সুরু হবে আবার কি ? ও ত' আছেই চিরকাল। এইত' আজ কয়েক মাস হলো একটি বিদেশী মেয়েকে ওরা নিয়ে গেছে—আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে। ভারী সুন্দর তার চেহারা—যেন ডানা কাটা পরী। কোথা

থেকে ধরে এনেছে কে জানে, ওদের কাছে মেয়ে পুরুষ কোন ভেদ নেই—যৌবন বয়স হলেই হলো।

চমকে উঠলে শাহাজাদা—একি তবে তাঁর রাবেয়া! অজানা পথে গিয়ে শেষে ডাকাতের হাতে পরেছে? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তাঁর মন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "তা হলে ওকে দিয়ে ওরা বেশ মোটা রকমের দাও মারবে?"

মালিক বললেন, "নিশ্চয়ই। বসরার হাটই হচ্ছে এদিককার সবচেয়ে বড় দাসী বিক্রীর জায়গা। আমার বিশ্বাস শয়তানরা তাকে সেখানেই নিয়ে বিক্রী করেছে।"

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে দুজনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন—যার যার কামরায়। পরদিন ভোরেই শাহজাদা কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়লেন বসরার পথে। প্রায় পনরদিন পথ চলে তিনি এসে পৌঁছলেন বসরা-শহরে। মস্ত বড় শহর দেশ বিদেশের বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করে এই শহরে। সমস্ত আরব আর ইরাকের কাজ কারবারের কেন্দ্র এই স্থান। শাহাজাদা চললে সহরের ভেতর দিয়ে। চলতে চলতে সামনেই পড়লো এক মস্ত বাড়ি—চারিদিকে হরেক রকমের ফল, ফুলের বাগান। মাঝখানে শ্বেত পাথরের তৈরী মহল—চারভাগে বিভক্ত। ঢাল তলোয়ার হাতে ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা সেপাই সব পাহারা দিচ্ছে মহলের চারিদিকে। নিশ্চয় কোন আমির ওমরাহের বাড়ি হবে! চলেছেন শাহাজাদা রাস্তা দিয়ে আর ভাবছেন রাবেয়ার কথা—কোথা গেলে তার দেখা মিলবে। এমন সময় কে হাঁক দিলে, "এই মুছাফির খাড়া রহো—"। চমকে দাঁড়িয়ে গেলেন শাহজাদা। অবাক হয়ে তাকাতে লাগলেন চারিদিকে। আবার শব্দ হলো, "ওখানে দাঁড়িয়ে থাক—একপাও নড়োনা।" দোতলার

বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলো একজন সেপাই, হাতের ইসারায় তাঁকে আসতে বলে সে নীচে নেমে গেল। তারপর তাঁর কাছে এসে বললে, "বেগম সাহেব তোমাকে তলব করেছেন চল এক্ষণি।" বিস্মিত হয়ে শাহাজাদা বললেন, "বেগম সাহেবা তলব করেছেন—আমাকে—না, তুমি ভুল করছো।"

সেপাই বললে, "হাঁ, হাঁ, তোমাকেই। উপরে চেয়ে দেখ—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—জানালার ধারে।"

মাথা তুলে শাহাজাদা দেখলেন মহলের দোতলায় জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন এক সুন্দরী মহিলা, বয়স আন্দাজ বছর তিরিশ, —পরণে তাঁর বহুমূল্য রেশমের পোষাক। বিনা বাক্যব্যয়ে শাহজাদা চলে গেলেন সেপাইয়ের সাথে।

সেপাইএর সাথে নুরুদ্দীন গিয়ে প্রবেশ করলে এক মস্ত ঘরের মধ্যে। ঘরখানি নানারকম সাজসজ্জা দিয়ে সাজান, মেজেতে বহুমূল্য মখমলের গালিচা। সেপাই নুরুদ্দীনকে বললে "এখানে দাঁড়াও বেগমসাহেবা এখনি আসবেন।" কথা শেষ হতে না হতেই সামনের পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন এক পরমাসুন্দরী মহিলা। মহিলার বয়স এই চব্বিশ কি পঁচিশ হবে, টকটকে ফর্সা গায়ের রং, দেহের গড়ন আর চোখ মুখও বেশ। কিন্তু কেমন যেন একটু উগ্রভাব। পরণে তাঁর বেগমের পোষাক ঝলমল করছে। বেগমকে কুর্ণীশ করে সেপাই চলে গেল সেখান থেকে।

নুরুদ্দীনও বেগমকে কুর্ণীশ করে দাঁড়ালেন একপাশে, মৃদু হেসে বেগম বললেন, "বিদেশী মুছাফির?" নুরুদ্দীন বললেন, "হাঁ বেগমসাহেবা, আমি বিদেশী মুছাফির—দেশ ভ্রমণই আমার পেশা।"

বেগম বললেন, "কিন্তু এ বয়সে তোমার এভাব হল কেন?

তোমাকে দেখেতে' বেশ বড় ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে! কেন আর অনর্থক দেশ-বিদেশ ঘুরে কষ্ট পাবে? আমি কাজ দিচ্ছি—এখানেই থেকে যাও।" নুরুদ্দীন দেখলেন এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। এখানে থাকতে পারলে রাবেয়ার খোঁজ বের করতে তাঁর খুব অসুবিধা হবে না। এই ভেবে নুরুদ্দীন বললেন, "বহুত মেহেরবাণী বেগমসাহেবার যদি এখানে থাকবার জায়গা পাই আমারও আর ঘোরাঘুরি ভাল লাগছে না।"

নুরুদ্দীনের কথায় বেগম সুখী হয়ে হর্ষোৎফুল্লস্বরে বললেন, "তোমার কথায় বড় আনন্দ হলো। আজ থেকে তুমি আমার মহলের দাস-দাসীদের কাজ পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হলে। দিনের শেষে রোজ এসে তুমি আমাকে জানাবে সারাদিনের খবর। আমার বাহির মহলে তোমার থাকা খাওয়ার স্থান হবে।" এই কথা বলে বেগম তাঁর উজির নিয়ামত আলীকে ডেকে পাঠালেন। তলব পেয়ে এলেন নিয়ামত আলী। বেগম তাঁকে সব কথা বলে নুরুদ্দীনের সব বন্দোবস্ত করে দিতে হুকুম দিলেন। কুর্ণীশ করে উজির চলে গেলেন—নুরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে।

এইভাবে চললো প্রায় এক মাস। নুরুদ্দীনের আচার ব্যবহারে বেগম ক্রমেই তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লেন খুব বেশী রকম। প্রথম দৃষ্টিতেই ওঁকে তাঁর খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। এবার ইচ্ছা হলো একেবারে বিবাহ করতে—কিন্তু আরো দেখতে হবে, তারপর নুরুদ্দীনকে বলবেন তাঁর মনের কথা। এই ভেবে বেগম চুপ করে গেলেন। এরই মধ্যে হলো কি—বেগম হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন—শোবার ঘর ছেড়ে বেরোলেন না। সন্ধ্যার পর নুরুদ্দীন খবর দিতে এলে বেগমের আদেশে তাঁকে অন্দরমহলে একেবারে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে আসা হলো। অন্দরমহলে পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই কিন্তু

দুদিন পর যাকে জীবনের সঙ্গী বলেই গ্রহণ করতে হবে তাকে আর এখানে আসতে দিতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

সোনার খাটের উপর নরম মখমলের বিছানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় বসে আছেন বেগম। পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করছে রাবেয়া। ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালেন নুরুদ্দীন— আরে এই যে এখানেই রয়েছে তাঁর হারানিধি—এত কাছে—আর তিনি ঘুরে বেড়ালেন এতদিন সারা দুনিয়া? অভিভূত হয়ে পড়লেন শাহজাদা। বেগমকে কুর্ণীশ করতেও ভুলে গেলেন। এদিকে রাবেয়ার অবস্থাও সেইরূপ—মুখে কথা সরছে না—একদৃষ্টে চেয়ে আছে নুরুদ্দীনের দিকে—দুচোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অজস্র অশ্রুধারা।

দুজনের অবস্থা দেখে বেগম তো অবাক! এর অর্থ কি—তবে কি এরা পরস্পরকে চেনে? শুধু চেনা নয়—ভালবাসে—একে অন্যকে মন-প্রাণ দিয়ে। নইলে এত চোখের জল ফেলা কেন। জ্বলে উঠলো বেগমের মন। এতদিন ধরে তিনি মনে মনে যে আশা পোষণ করে আসছেন—একটা বাঁদী এসে দাঁড়ালো তাতে বাদ সাধতে? কিন্তু এ তিনি মোটেই মানবেন না—যে রকম করে হোক—এ বাধা তিনি সরিয়ে ফেলবেনই। তবে এখনি কিছু করা উচিত নয়—হয়ত এতে শেষে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। মনের ভাব চেপে নিয়ে বেগম বললেন, "ওকি তোমরা দুজনে হঠাৎ এরকম হয়ে গেলে কেন? রাবেয়া! রাবেয়া!"

চমক ভেঙ্গে রাবেয়া বললে, "হুজুরাইন, "হুজুরাইন, হুকুম করুন।" কঠোর দৃষ্টিতে দুজনের উপর চোখ বুলিয়ে বেগম বললেন, "এর অর্থ কি? এই লোকটা তোকে দেখে এরকম হয়ে গেল কেন?—কুর্ণীশ করা পর্য্যন্ত ভুলে গেল! তোদের দুজনের মধ্যে তবে আগে থেকে জানা আছে?"

কুর্ণিশ করে নুরুদ্দীন বললেন, "হাঁ হুজুরাইন! জানা-শোনা আছে—শুধু জানা-শোনা নয়—দুজনে-দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ওরই জন্য আমি ঘর ছাড়া—দেওয়ানা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।" বলতে বলতে নুরুদ্দীন চোখের জলে ভেসে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে গেলেন বেগম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নুরুদ্দীনকে বললেন, "ও, তাই এরকম হয়ে গিয়েছিলে—আচ্ছা—এখন তুমি যেতে পার। পরে যা শুনবার শুনবো।" কুর্ণীশ করে নুরুদ্দীন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

নুরুদ্দীন চলে যেতেই রাবেয়া চোখ মুছে বেগমকে আবার হাওয়া করতে লাগলো। তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে রইলেন বেগম রাবেয়ার সংস্রব আর তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না। হাওয়া যেন বিষের মত মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর হতাশ কণ্ঠে বললেন, "তুই এখন যেতে পারিস রাবেয়া—আর হাওয়া ভাল লাগছে না। হাঁ, আর একটা কথা—যাবার সময় অমনি আমার ধাইমাকে বলে যাস—আমি তাকে তলব করেছি।"

কুর্ণীশ করে চলে গেল রাবেয়া। আর বেগম বসে ভাবতে লাগলেন আকাশ-পাতাল—কি করে কি করা যায়। এমন সময় ধাইমা এসে ঢুকলো ঘরের ভেতর, "আম্মাজান কি আমাকে তলব করেছ? শরীর কেমন আজ আম্মাজান?"

পাশের আসন দেখিয়ে বেগম বললেন, "বস, কথা আছে।" সেপায়া টেনে এনে একেবারে বেগমের কাছ ঘেঁসে বসলো ধাইমা,—"কি কথা আম্মাজান?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর তাঁর মনের কথা সমস্ত প্রকাশ করে বললেন, "এখন কি করে আমার পথের কাঁটা

সরাতে পারি বলতো ধাইমা। রাবেয়ার প্রাণদণ্ড দেব—না নির্ব্বাসন দিয়ে দেব।"

একটু ভেবে নিয়ে ধাইমা বললে, "ওসব করতে যেওনা আম্মাজান—তাতে ফল উল্টো হবে। তুমি যে রকম বলছো তাতে খোলাখুলি ছুঁড়িকে কোন শাস্তি দিলে ছোঁড়াকে তুমি পাবে না কিছুতেই না। যা কিছু করতে হয় কৌশলে হবে—বুঝলে ?

উৎসাহের সহিত উঠে বসে বেগম বললেন, "কি করলে সুবিধা হবে আমাকে বুঝিয়ে বল ধাইমা—যাতে কাঁটাও দূর হয় আর কাজও হাসিল হয়।"

ধাইমা বললে, "শোন, কাজটা অতি সহজ কিন্তু বড়ই নির্ম্মম। রাবেয়ার খাবারের সাথে জহর মিশিয়ে দিতে হবে। আমার এ রকম জিনিস জানা আছে যার এতটুকু খাবারের সাথে খাইয়ে দিলেই ব্যাস্—আর দেখতে হবে না। তবে কাজ হবে একটু ধীরে, প্রথম দু-তিনদিন কিছুই বুঝতে পারবে না—চারদিনের দিন থেকে কাজ সুরু হবে—তারপর পনর গেলে ফতে। এতে ফল এই হবে ঐ ছোঁড়া কিছুতেই বুঝতে পারবে না কিসে কি হল। আমরা রটিয়ে দেব রাবেয়ার শক্ত অসুখে মৃত্যু হয়েছে। কয়েকদিন হয়ত কিছু কান্নাকাটি করতে পারে—তারপর তুমি মায়াজাল পেতে ধরে নিও তাকে—তোমার মধ্যে। পুরুষের মন কতদিন আর স্থির থাকবে !"

তাই হলো। দিন সাতেক পর হঠাৎ একদিন রাবেয়া বেগমকে বাতাস করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ওষুধ ধরেছে দেখে বেগম তো ভারী খুশী—কিন্তু মনেরভাব চেপে

নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে কে আছিস—জল দে, বাতাস কর"—দাসীদের জল হাওয়া পেয়ে রাবেয়ার জ্ঞান ফিরে এলো—ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। তারপর একজন দাসীর কাঁধে ভর করে চলে গেল নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে রাবেয়া সেই যে শয্যা নিলে আর উঠলো না। বেগম হেকিম ডাকিয়ে বহু চিকিৎসা করালেন তার—লোক দেখানো চিকিৎসা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ষোল দিনের দিন রাবেয়া চলে গেল নুরুদ্দীনের বুক ভেঙ্গে—চিরকালের মত।

রাবেয়ার গুরুতর অসুখ শুনে নুরুদ্দীন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। বহু এত্তালা করেও তাঁকে শুধু একবার চোখের দেখাও দেখতে পারেননি—বেগম সে হুকুম দেননি। মনের দুঃখে নুরুদ্দীন ঘরে বসে শুধু চোখের জলেই ভেসেছেন আর কিছু করতে পারেননি। ষোল দিনের দিন যখন দাসেরা রাবেয়ার মৃতদেহ নিয়ে বের হল মহল থেকে—তখন নুরুদ্দীনও চললেন-তাদের সাথে! পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে—মাতালের মত চলেছেন তিনি—চোখে জল শুকিয়ে গেছে—বুকের ভেতরে আগুনে জ্বলছে—কথা বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর।

যথানিয়মে কবর দেওয়া হয়ে গেল। ঠায় বসে নুরুদ্দীন দেখলেন সব—তারপর উঠে সকলের সাথে ফিরে গেলেন—মহলের ভেতর। পরদিন ভোর হলে দেখা—রাবেয়ার কবরের উপর পড়ে আছে নুরুদ্দীনের দেহ—তাতে প্রাণ নেই খবর গেল বেগমের কাছে। বিদ্রূপের হাসি হেসে তিনি শুধু বললেন, "হতভাগার নসীবে সুখ নেই—কে কি করবে?"

গল্পটি শেষ করে ফতিমা বললে, "কেমন আম্মাজান? এই কাহিনীটি কেমন লাগলো বলত?" শাহাজাদীর মুখে কথা নাই

—টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়ছে তাঁর দুচোখ বেয়ে। সন্দেহে শাহাজাদীর হাত দুখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে ফতিমা বললে, "এবার ঠিক হয়েছে তো আম্মাজান, তাহলে শাহানশাহকে বলি তোমার বিয়ের কথা।"

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে শাহাজাদী বললেন, "তোমার এ কাহিনীর মত আর দু'টি হয় না—ধাইমা। কি অপূর্ব্ব প্রেম আর আত্মত্যাগ—কিন্তু সত্যিই কি ও রকম হয় ?"

ফতিমা বললে, "হয় আম্মাজান। খোদার দুনিয়ায় সবই সম্ভব হয়। আমি তাহলে শাহানশাহকে গিয়ে বলি যে তুমি বিয়ে করতে রাজী—কেমন ?"

একটু লজ্জার হাসি হেসে শাহাজাদী বললেন, "যা খুশী তোমার কর না বাপু—আমি কি আর নিষেধ করছি ?" আনন্দে অধীর হয়ে চলে গেল ফতিমা, সুলতানের কাছে—গিয়ে বললো সব কথা। খুসী হয়ে সুলতান তাকে ইনাম দিলেন নিজের গলার হার আর একতাড়া সোনার মোহর। শুভদিনে শাহজাদা ইমামউদ্দীনের সহিত শাহজাদী ফরোখনাজের বিবাহ হয়ে গেল। সাতদিন সাতরাত্রি ধরে চললো আমোদ উৎসব—পোলাও মাংস আর মিষ্টি খেয়ে রাজ্যে লোকের অরুচি ধরে গেল।

—শেষ—